এনজিও প্রশাসন ও কার্যক্রমে নারী-পুরুষ সম্পর্ক :
৩টি এনজিও নমুনার আলোকে

GIFT

404193

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Library
404193

এম.ফিল গবেষণাপত্র
লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এনজিও প্রশাসন ও কার্যক্রমে নারী-পুরুষ সম্পর্ক :
৩টি এনজিও নমুনার আলোকে

404193

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

গবেষক

তাসলিমা আখ্‌তার
শিক্ষাবর্ষ : ১৯৯৮-১৯৯৯
রেজিস্ট্রেশন : ৩২১
লোক প্রশাসন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধায়কের অনুমোদন

404193

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

N.A. Kalimullah

17.07.05

(ডক্টর নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ)
প্রফেসর
লোক প্রশাসন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যে কোনো গবেষণাকর্ম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সংগঠিত করা এবং একে সুসম্পন্ন করা খুব সহজ নয়। 'এনজিও প্রশাসন ও কার্যক্রমে নারী-পুরুষ সম্পর্ক : ৩টি এনজিও নমুনার আলোকে' শীর্ষক গবেষণাটি সংগঠিত করা এবং শেষ পর্যন্ত একে সম্পন্ন করার দুরূহ কাজে আমার একার কৃতিত্ব নেই। যাদের সহযোগিতা, সাহস, শুভ কামনা, অংশগ্রহণ এ কাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছে তাদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

প্রথমেই আমি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই তাদেরকে, যাদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতেই আমি আমার পর্যালোচনা দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছি। তাঁরা হলেন– ব্র্যাক, প্রশিকা ও নাগরিক উদ্যোগের আওতাধীন দরিদ্র গ্রামীণ নারীরা। একই সাথে এনজিও কার্যক্রমগুলোকে মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন যেসব মাঠকর্মীরা, তাদের সবাইকে।

গবেষণা কর্মটি যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য বারবার তাগিদ দিয়েছেন এবং আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড.নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ। তাঁর প্রতি আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নানাভাবে পরামর্শ ও সাহস দিয়েছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। গবেষণার অঞ্চল হিসেবে ব্র্যাকে কাজ করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন জনাব আফসান চৌধুরী। তাঁর সহযোগিতা ছাড়া ব্র্যাকের মতো বড় প্রতিষ্ঠানে এত সহজে কাজ করা সম্ভব ছিল না। তাঁর সাথে ক্ষুদ্র ঋণ, নারী ইত্যাদি প্রশ্নে আলোচনা এনজিওর বর্তমান অবস্থা বুঝতে সাহায্য করেছে। প্রশিকার রফিকা আক্তার আর নাগরিক উদ্যোগের মৌসুমী শারমিন মৌমিতা ওই সংস্থাগুলোতে কাজ করতে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন। প্রকাশনা পর্যালোচনার কাজে নাগরিক উদ্যোগের পাঠাগার অনেক সহায়ক হয়েছে। পাঠাগার ব্যবহারে সহযোগিতার জন্য নাগরিক উদ্যোগের নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেনকে জানাই ধন্যবাদ। একইসাথে আমি তাঁদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ যারা আমাকে এ কাজে সাহায্য করেছেন।

এ কাজে আরো সহযোগিতা করেছেন বন্ধু শ্যামলী শীল। তার নিজস্ব গবেষণার অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পাশাপাশি সংগৃহীত তথ্যকে পরিসাংখ্যিক পদ্ধতিতে সাজানোর কষ্টসাধ্য কাজে তিনি আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন। গবেষণা কর্মটি কম্পোজ করার কাজে সহযোগিতা করেছেন সাজিদ তৌহিদ। এর পাশাপাশি যারা অনুবাদ, তথ্য সংগ্রহ, বই প্রদান ইত্যাদি কাজে সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন– নাসিমা আখ্‌তার, কামরুল হুদা, মনির উদ্দীন পাপ্পু, আরিফুল ইসলাম, এম.জে ফেরদৌস, মঞ্জুরুল ইসলাম দিপলু, জুলহাসনাইন বাবু, কানিজ ফাতেমা, রেবেকা নীলা, ফিরোজ আলম সুমন ও আরো অনেকে। এই কাজ সম্পাদন করতে আরো সহযোগিতা করেছেন জোনায়েদ সাকি। আমি তাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞ।

সবশেষে এই কাজটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে মানসিক এবং আর্থিক সমর্থন যারা সবচেয়ে বেশি যুগিয়েছেন তারা হলেন আমার মা বেগম জীবুন্নেসা এবং বাবা জনাব সামসুল হুদা। আমি তাদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। পরিবারের অন্য সদস্যদের মধ্যে ভাই-বোন সবাই আমাকে সাহায্য করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
গবেষণার উদ্দেশ্য, সমস্যা, পদ্ধতি ও বিন্যাস ০১

❑

দ্বিতীয় অধ্যায়
আলোচ্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রকাশনার পর্যালোচনা ০৫

❑

তৃতীয় অধ্যায়
বাংলাদেশে এনজিও ও নারীর অবস্থা ১৩

❑

চতুর্থ অধ্যায়
নমুনা হিসেবে গৃহীত ৩টি এনজিওর পরিচিতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১৬

❑

পঞ্চম অধ্যায়
গবেষণার জন্য এনজিওসমূহের নির্দিষ্ট কার্যক্রমের পরিচিতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ২৩
অতিদরিদ্র কর্মসূচি, ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি, শিক্ষা কার্যক্রম, আইন সহায়তা কার্যক্রম
জেন্ডার বিষয়ক নীতিমালা ও জেন্ডার কোয়ালিটি অ্যাকশন প্রোগ্রাম

❑

ষষ্ঠ অধ্যায়
এনজিওত্রয়ের প্রশাসনিক কাঠামোয় নারীর অবস্থা ও অবস্থানের পর্যালোচনা ৩৪
আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা, নীতিনির্ধারণ প্রসঙ্গ, বেতন ও ছুটি প্রসঙ্গ
কাজের পরিবেশ ও প্রশিক্ষণের ফলাফল, কর্মসন্তুষ্টি প্রসঙ্গ

❑

সপ্তম অধ্যায়
প্রাপ্ত তথ্যের ফলাফলের ভিত্তিতে এনজিওত্রয়ের কার্যক্রমে ৪১
আওতাভুক্ত নারীর অবস্থা ও অবস্থান পর্যালোচনা

❑

অষ্টম অধ্যায়
নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী-পুরুষ সম্পর্কের ৫৪
সামগ্রিক পর্যালোচনা

❑

নবম অধ্যায়
উপসংহার ৬২

❑

পরিশিষ্ট
কেসস্টাডি, প্রশ্নমালা, অর্গানোগ্রাম ও গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

প্র | থ | ম | অ | ধ্যা | য়

গবেষণার উদ্দেশ্য, সমস্যা, পদ্ধতি ও বিন্যাস

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার উদ্দেশ্য, সমস্যা, পদ্ধতি ও বিন্যাস

নারীর 'ক্ষমতায়ন' 'অবস্থান পরিবর্তন' 'উন্নয়ন' 'নারী-পুরুষ সম্পর্কের সমতা আনয়ন' 'মূল স্রোতের সাথে অংশগ্রহণ' ইত্যাদি বিভিন্ন শব্দবন্ধে নারী এবং নারীর অধিকার আদায় প্রশ্নে কর্মরত আছে বর্তমান বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা। এই বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও'র দেশব্যাপী বিস্তৃত তৃণমূল পর্যায়ে কাজের মধ্যে এটা লক্ষণীয় যে, এদের অন্যতম কর্মসূচিতে পরিণত হয়েছে নারী প্রশ্ন। ৮০ ও ৯০ দশকের পরবর্তী সময়ে সরকারের উদ্যোগের পাশে নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতে সম্পৃক্ত করার প্রত্যয়ে এনজিওগুলো নারীকে 'টার্গেট' গ্রুপ হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের কর্মসূচি সজ্জিত করে।

দেশের ৬৪টি জেলার সর্বত্রই এখন বিরাজ করছে এনজিও তৎপরতা। বৃহৎ এনজিওগুলোর মধ্যে ব্র্যাক, প্রশিকা, আশা, কেয়ার ইত্যাদি সংগঠনের প্রধান কার্যক্রম গ্রামকেন্দ্রিক এবং গ্রামীণ নারীরাই এদের কর্মসূচির প্রাণশক্তি। এনজিও কর্মসূচির মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ, কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিকারী কার্যক্রম, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কার্যক্রম সবগুলোতেই 'নারীকে টার্গেট' গ্রুপ হিসেবে চিহ্নিত করে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

এসব সংস্থা নারী ও পুরুষ উভয়কে নিয়ে কাজ করলেও এদের প্রধান মনোযোগ নারী সদস্যকেন্দ্রিক। এদের কর্মসূচির সদস্য বা সুবিধাভোগী হবার সুযোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীদের থাকে। সমাজের অর্ধেক অংশ যারা উৎপাদনশীল কার্যক্রম এবং বাজার অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না তাদেরকেই 'উন্নয়নের হাতিয়ার' হিসেবে তারা চিহ্নিত করে যোগাযোগ ঘটায় বাজারের সাথে তাদের শ্রমের। দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এনজিও কার্যক্রমের মাধ্যমে এই শ্রম অর্থনীতির বাজারে কিভাবে যুক্ত হচ্ছে এবং এর সাথে সংস্থার ঘোষণা, কর্মসূচিতে যেভাবে নারীর উন্নয়ন প্রশ্নটিকে সামনে হাজির করছে তার পর্যালোচনা এ সময়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এনজিও কেবল তাদের কার্যক্রমেই নয়, প্রশাসনিক কাঠামোতেও নারী-পুরুষের সমতা প্রশ্নটিকে সম্পৃক্ত করেছে। ফলে এনজিও কর্মী ও সদস্যদের মধ্যে বর্তমানে চালু রয়েছে নারী, জেন্ডার, উন্নয়ন, সমাজ ও নারী সচেতনতামূলক ইত্যাদি বিষয়ে নানারকম প্রশিক্ষণ।

এনজিও প্রশাসন ও কার্যক্রমে 'নারী-পুরুষ সম্পর্কের সমতা' বিষয়ক যে গুরুত্ব তাদের দলিলপত্রসহ পত্রপত্রিকার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, সমাজে নারীর অবস্থানকে বোঝার জন্য তার 'সামাজিক তাৎপর্য'কে বিশ্লেষণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পাশাপাশি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় এনজিওর তৎপরতা নারীর অবস্থান পরিবর্তনে কতটা কার্যকর ভূমিকা রেখেছে তা বোঝার জন্য এ বিষয়ক গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ। তাই বর্তমানে তৃণমূল পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি এনজিও কতটা সামনে আনতে পেরেছে সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পর্যালোচনা করাই এ গবেষণার উদ্দেশ্য।

'এনজিও প্রশাসন ও কার্যক্রমে নারী-পুরুষ সম্পর্ক : ৩টি এনজিও নমুনার আলোকে' এই শিরোনামের মধ্য দিয়ে গবেষণার বিষয় হিসেবে বর্তমান সমাজব্যবস্থায় নারীর অধঃস্তনতা, নারী-পুরুষের সম্পর্কের অসমতা কিভাবে এনজিও প্রশাসন ও কার্যক্রমে প্রভাব ফেলছে সে বিষয়টিই বোঝানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার মাধ্যমে ব্র্যাক, প্রশিকা, নাগরিক উদ্যোগ– এ তিনটি এনজিওর কার্যক্রমের প্রভাব নারী প্রশ্নে কি ভূমিকা রেখেছে তা পর্যবেক্ষণ করা হয়। ব্র্যাক, প্রশিকা, নাগরিক উদ্যোগ– এ তিনটি সংগঠনের মধ্যে ব্র্যাক ও প্রশিকা প্রায় কাছাকাছি ধরনের বিষয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে। উভয়ের কার্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য গ্রামীণ দরিদ্র নারী সমাজের সবচেয়ে নিপীড়িত অংশকে উন্নয়নের মূলধারায় নিয়ে আসা। একই সাথে তাদের আরো যে কার্যক্রম রয়েছে তা হলো– ক্ষুদ্র ঋণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আয়বৃদ্ধিকারী কর্মসূচি ইত্যাদি। আর নাগরিক উদ্যোগ নামক সংস্থাটি মূলত মানবাধিকার ও আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে। তৃণমূল পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কাজ করা নাগরিক উদ্যোগের আগ্রহের জায়গা। এ তিনটি সংগঠনের প্রশাসনিক ও কার্যক্রমের নারী প্রশ্নে কী মাত্রায় কাজ করছে তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য তাদের উদ্দেশ্যের আলোকেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে গবেষণার নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য।

ক. এনজিও প্রশাসনিক কাঠামোয় নারীর অবস্থা কী এবং এনজিওর তৎপরতা প্রশাসনিক কাঠামোয় নারী-পুরুষ সম্পর্কে কী পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

খ. ক্ষুদ্র ঋণ, শিক্ষা, আইনি সুবিধা প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে নারী-পুরুষের সমতা বা নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে কিনা।

গ. এনজিওর নারী প্রশ্নে মতাদর্শিক অবস্থার সাথে ব্যবহারিক কাজের সম্পর্ক।

গবেষণার সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা

গবেষণা কর্মের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রাথমিক প্রকল্প সুনির্দিষ্টকরণ। এবং সেই অনুযায়ী প্রশ্নমালা, সাক্ষাৎকার, কাজের অঞ্চল ও তথ্য সংগ্রহ করা। গবেষণার বিষয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কাঙ্ক্ষিত তথ্যের সম্পর্ক স্থাপন। এই প্রাথমিক প্রকল্প দাঁড় করানোর গুরুত্বপূর্ণ কাজটি গবেষণার কাজকে অনেক দূর এগিয়ে নেয় এবং সহজ করে। তা না হলে অনেক সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা থাকে। এটি আমার প্রথম গবেষণা কর্ম হওয়ায় অভিজ্ঞতার অভাবের কারণে গবেষণায় এ ধরনের বেশকিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে, যা গবেষণা কর্মের শেষ পর্যায়ে এসে উপলব্ধি হয়েছে অনেক বেশি। নিচে কিছু সমস্যা উল্লেখ করা হলো–

- ৩টি এনজিও নমুনার আলোকে গবেষণা কর্মটি করার লক্ষ্য নিয়ে কাজে নামলেও পরে দেখা যায়, বিষয়টির পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত। ৩টি এনজিওতে স্বল্প সময়ে সমানভাবে গুরুত্বের সাথে কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ সময় ও অর্থসাপেক্ষ। ফলে একটি এনজিওর ওপরই বিশেষ গুরুত্বারোপ করতে হয়েছে।

- গবেষণা কর্মটিতে কাজের অঞ্চল বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও দুর্বলতা ছিল। ফলে গবেষণাকর্ম পরিচালনা করার জন্য মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য অনুমতি গ্রহণসহ অন্যান্য আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় সময়সাপেক্ষ হয়েছে কর্মসূচি পর্যবেক্ষণ। কিন্তু সেই অনুযায়ী ফলাফল পাওয়া যায়নি।

- মাঠপর্যায়ে কাজ করার ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা/গ্রামের সদস্যদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ না করে আলাদা আলাদা গ্রামের সদস্যদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। ফলে নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলে এনজিওর কাজের প্রভাব বোঝা যায়নি।

- প্রশাসনিক কর্মকর্তা বা এনজিও সদস্যরা তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে সহযোগী থাকলেও এনজিও কার্যক্রম সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা বা পর্যালোচনা কিছু কিছু জায়গায় খোলামেলা ছিল না। তারা নিজস্ব মূল্যায়ন দেবার ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত হবার বদলে সংস্থার কাগুজে ভাষায় মূল্যায়ন করেন। এর পেছনে এনজিও কর্মীদের 'চাকরির নিশ্চয়তা'র বিষয়টি জড়িত থাকায় অনেক সময় সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি।

- মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকালে তথ্যদানকারীরা প্রায়শই আমাকে এনজিওর হেড অফিসের কর্মী অথবা সরকারি কর্মী হিসেবে ভাবেন। ফলে সঠিক তথ্যদানে কেউ কেউ বিরত থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

- পুরো গবেষণা কর্মটির জন্য যে পরিমাণ সময় ও মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন ছিল তা পর্যাপ্ত পরিমাণে দেয়া সম্ভব হয়নি।
- গবেষণার মধ্যম পর্যায়ে আর্থিক সংকটের কারণে বেশ কিছুদিন কাজের গতি মন্থর হয়ে পড়ে। যদিও পরবর্তীতে তা কাটানো সম্ভব হয়। কিন্তু তখন সময় স্বল্পতায় দ্রুত কাজটি সম্পন্ন করতে হয়।

গবেষণার পদ্ধতি

গবেষণার পদ্ধতি হিসেবে প্রাথমিকভাবে এনজিওর ইতিহাস, বর্তমান কার্যক্রম এবং বাংলাদেশে নারীর অবস্থা বোঝার জন্য বিভিন্ন লেখক-গবেষকের গ্রন্থ-গবেষণা-প্রবন্ধ পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়া কাজের জন্য নির্ধারিত ৩টি এনজিওর নিজস্ব মতাদর্শ এবং কর্মপদ্ধতি বিষয়ক দলিলপত্র, জার্নাল, বার্ষিক প্রতিবেদন, নারীবিষয়ক নীতিমালা, প্রামাণ্যচিত্র পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নারী প্রশ্নে এনজিওর মতাদর্শিক ও কর্মসূচিগত অবস্থানকে মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। এনজিও প্রশাসনে নারীর অবস্থা বোঝার জন্য স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কর্মী-সদস্য-কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। তাদের কর্মপদ্ধতি-লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও তার প্রয়োগের দিকটি স্পষ্ট করার জন্যে মাঠপর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়।

মাঠপর্যায়ে এনজিওর কার্যক্রম যেমন– ক্ষুদ্র ঋণ, শিক্ষা, অতিদরিদ্রদের সহায়তা, আইনি সহায়তার জন্য সালিশ ইত্যাদি কার্যক্রমের প্রায়োগিক দিক পর্যবেক্ষণের জন্য জরিপ, ফোকাস দল, সাক্ষাৎকার, কেসস্টাডি ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

গবেষণার অঞ্চল হিসেবে ব্র্যাকের ৪টি অঞ্চলে মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। নীলফামারী জেলা সদরে TUP (Targeting Ultra Poor) অতিদরিদ্রদের অনুদান প্রদান। রাজশাহীর পবা থানা ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি ও GQAL (Gender Quality Action Learning)। নোয়াখালীর অশ্বদিয়া ইউনিয়ন ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি। ঢাকায় কামরাঙ্গীরচরে শিক্ষা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয়।

প্রশিকায় মোহাম্মদপুর অঞ্চলের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি এবং নাগরিক উদ্যোগের টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতিতে সালিশ কর্মসূচি পর্যবেক্ষণ করা হয়।

গবেষণার বিন্যাস

গবেষণাকর্মটি পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এবং এবং তার আলোকে সমগ্র গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়।

প্রথম অধ্যায়
গবেষণার উদ্দেশ্য, সমস্যা, পদ্ধতি ও বিন্যাস

দ্বিতীয় অধ্যায়
আলোচ্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রকাশনার পর্যালোচনা

তৃতীয় অধ্যায়
বাংলাদেশে এনজিও ও নারীর অবস্থা

চতুর্থ অধ্যায়
নমুনা হিসাবে গৃহীত ৩ টি এনজিও:
ব্র্যাক, প্রশিকা ও নাগরিক উদ্যোগের পরিচিতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পঞ্চম অধ্যায়
গবেষণার জন্য এনজিওসমূহের নির্দিষ্ট কার্যক্রমে পরিচিতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
অতিদরিদ্র কর্মসূচি, ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি, শিক্ষা কার্যক্রম, আইন সহায়তা কার্যক্রম
জেন্ডার বিষয়ক নীতিমালা ও জেন্ডার কোয়ালিটি অ্যাকশন প্রোগ্রাম

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়
আলোচ্য এনজিওত্রয়ের প্রশাসনিক কাঠামোয় নারীর অবস্থা ও অবস্থানের পর্যালোচনা
অর্গানোগ্রাম, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা
নীতিনির্ধারণ প্রসঙ্গ, বেতন ও ছুটি প্রসঙ্গ, কাজের পরিবেশ ও
প্রশিক্ষণের ফলাফল, কর্মসন্তুষ্টি প্রসঙ্গ

সপ্তম অধ্যায়
প্রাপ্ত তথ্যের ফলাফলের ভিত্তিতে এনজিওত্রয়ের
কার্যক্রমের আওতাভূক্ত নারীর অবস্থা ও অবস্থান পর্যালোচনা

অষ্টম অধ্যায়
নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী-পুরুষের
সম্পর্কের সামগ্রিক পর্যালোচনা

নবম অধ্যায়
উপসংহার

পরিশিষ্ট
কেসস্টাডি, প্রশ্নমালা, অর্গানোগ্রাম ও গ্রন্থপঞ্জি

উপরোক্ত বিন্যাসের আলোকেই গবেষণাকর্মটি তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য নিয়ে পরিচালিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বি | তী | য় | অ | ধ্যা | য়

আলোচ্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রকাশনার পর্যালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রকাশনার পর্যালোচনা

যেকোনো গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কে ইতিমধ্যে প্রকাশিত তত্ত্ব ও তথ্য ভিত্তিক প্রকাশনার পর্যালোচনা জরুরী পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে। যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট বিষয়ের ইতিহাস, প্রেক্ষাপট, তথ্য ও বিভিন্ন তাত্ত্বিক মতবাদ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। বোঝা যায়, নির্দিষ্ট বিষয়ে এ পর্যন্ত যারা গবেষণা করে গ্রন্থ-প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনা করেছেন তাদের অনুসন্ধান, চিন্তা এবং অবস্থান। বর্তমান গবেষণার প্রাক্কালে প্রকাশনা পর্যালোচনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি থেকেই বিভিন্ন তাত্ত্বিক, গবেষক, এনজিও প্রতিনিধির এনজিও ও নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে চিন্তা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রথমে তাত্ত্বিক পর্যালোচনায় এনজিওর অবস্থা ও তৎপরতা নিয়ে বশির আহমেদ ও আনু মুহাম্মদের লেখার মূল দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির প্রভাব নিয়ে মতামত তুলে ধরা হয়েছে এনজিও প্রতিনিধি ফজলে হাসান আবেদ ও মুহাম্মদ ইউনূসের। এনজিও ও নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয়ের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ঋণ, পরিবার পরিকল্পনার ভূমিকা নিয়ে আমিন রুহুল, সুলার সিডনি, খন্দকার শহীদুলের মতামতগুলোর দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। সবশেষে নারী প্রশ্নে, নারীর ক্ষমতায়নের বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আনু মুহাম্মদ, শামীমা পারভীন, কমলা ভাসিন ও মেঘনা গুহ ঠাকুরতার লেখার মূল দিকগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

বশির আহমেদ (২০০২) এক প্রবন্ধে বাংলাদেশে নারীর অবস্থানের আলোকে এনজিওর তৎপরতা বিষয়ে আলোচনা করেন। এখানে টার্গেট গ্রুপ হিসেবে 'নারী'কে বেছে নেবার পেছনে এনজিও নীতি বা দর্শন কী সে বিষয়টি তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশে অবস্থানরত এনজিওগুলোর মধ্যে প্রধানতম এনজিও ব্র্যাক, প্রশিকা, কারিতাস, বিএনপিএস'র নারী উন্নয়নমূলক কর্মসূচি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা পাওয়া যায় এই প্রবন্ধে।

নারী উন্নয়ন কর্মসূচির মূল্যায়ন করতে গিয়ে প্রবন্ধে বিভিন্ন কর্মসূচি ধরে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। এনজিও কর্মসূচি যেমন– সংগঠন বিনির্মাণ কর্মসূচি, আয় ও কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচি, ঋণ প্রদান ও বিনিয়োগ, স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম, বয়স্ক স্বাক্ষরতা কর্মসূচি, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, এডভোকেসি এবং লবিং, পরিবেশ সংরক্ষণ ও গণসংস্কৃতি কর্মসূচি, শিক্ষা কর্মসূচি, নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, মানবাধিকার ও আইনি সহায়তা ইত্যাদিতে নারীর ক্ষমতায়ন বা নারীর অবস্থান পরিবর্তনে কতটা ভূমিকা রেখেছে সে বিষয়টি তিনি সামনে এনেছেন। একই সাথে এনজিও কর্মীপর্যায়ে নারীর অবস্থান নিয়েও আলোচনা আছে প্রবন্ধে।

প্রবন্ধে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে :

- সরকারের পাশাপাশি এনজিওরা নারীকে উন্নয়নমূলক ধারায় নিয়ে আসার কথা বলে এবং উন্নয়ন টার্গেট হিসেবে নারীকে চিহ্নিত করে। এ কারণে এই বিষয়ক মূল্যায়ন আবশ্যক।
- নারীর সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার, বাজার অর্থনীতিতে ঢোকার সমান সুযোগ এবং পরিবার ও সমাজে নারী-পুরুষের বৈষম্যহীন ক্ষমতা সম্পর্ক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে নারীর অধীনস্থতা দূর হওয়া সম্পর্ক নিবিড়। এনজিওরা এসব পাশ কাটিয়ে প্রধানত নারীর তাৎক্ষণিক চাহিদা মেটানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

- এনজিও মতাদর্শগতভাবে পুরুষতন্ত্র ও পুরুষ পক্ষপাতকে বর্জন করে সমাজের আমূল পরিবর্তন চায় না। সমাজের অবস্থা অপরিবর্তিত রেখে নারীর উন্নয়নের পথে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আসবে না।
- গ্রামপর্যায়ে সংগঠন ও দল গড়ে তোলার মধ্যে এতে টার্গেট গ্রুপ সংগঠিত হচ্ছে। ঐক্যবদ্ধ থাকার চেতনা কিছুটা গড়ে উঠলেও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা এখানে প্রাধান্য লাভ করছে শেষপর্যন্ত।
- আয় ও কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচি, ঋণদান কর্মসূচি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সম্পত্তির প্রকৃত মালিকানা পরিবর্তিত হচ্ছে না। মালিকানা পুরুষের হাতেই থাকছে। ফলে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না। একদিকে তার শ্রমঘণ্টা বাড়ছে অন্যদিকে উৎপাদিত পণ্যের বাজারমূল্য থেকে টাকাও হচ্ছে।
- এনজিওদের এডভোকেসি সরকারি নীতি-নির্ধারণে সীমিত প্রভাব রাখলেও ব্যক্তি ও গ্রুপপর্যায়ে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে না।
- এনজিওরা প্রকৃতপক্ষে শোষণ-নিপীড়নের জন্য গ্রামীণ মাতব্বর ও স্থানীয় সরকারের কর্মচারীদেরকে দায়ী করলেও নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার রক্ষাকর্তা রাষ্ট্রযন্ত্রের ভূমিকাকে সামনে আনা থেকে বিরত থাকে।
- এনজিও বাজেট প্রকল্প ও সম্পদের সিংহভাগ আসে বিদেশ থেকে এবং স্বাভাবিকভাবেই এদের নীতি-কর্মপন্থা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা 'ডোনার' বা বিদেশী অর্থ যোগানদারদের মতামত অনুসারে নির্ধারিত হয়।

আনু মুহাম্মদ (১৯৯৯) এক গবেষণাধর্মী গ্রন্থে বাংলাদেশে এনজিওর অবস্থান, তার কর্মতৎপরতা এবং প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত রচনা করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন কিভাবে সত্তর দশকের পর থেকে এ দেশে 'উন্নয়নে'র বার্তা নিয়ে গ্রামীণ দরিদ্রদের দারিদ্র্যবিমোচনের উদ্যোগী হিসেবে এনজিওর প্রবেশ ঘটে। এ গ্রন্থের মাধ্যমে উন্নয়ন সংস্থা, সেবাদানকারী সংস্থা, তৃণমূল পর্যায়ে 'রাষ্ট্রের বিকল্প ধারা' হিসেবে দাঁড়ানো এনজিও, যার সংখ্যা বর্তমানে বাংলাদেশে হাজার ছাড়িয়ে গেছে তার সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা পাওয়া যায়।

ত্রাণ কার্যক্রম থেকে যাত্রা শুরু করে এনজিওরা বর্তমানে সারা দেশে তাদের কাজের বিস্তৃতি ঘটিয়েছে। ত্রাণ কার্যক্রম ছাপিয়ে বর্তমানে দারিদ্র্যবিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, জনগণের সচেতনতা সৃষ্টি, ক্ষুদ্র ঋণের বিরাট পদক্ষেপ, জনগণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, আইনি সহায়তা, পরিবেশ ইত্যাদি প্রশ্নে এনজিওরা কিভাবে কাজ করছে তার উল্লেখ রয়েছে গ্রন্থে।

উন্নয়ন সংকট এবং অর্থনৈতিক 'উন্নয়ন' প্রক্রিয়ায় এনজিওর অপরিহার্যতা আলোচনায় লেখক বলেন, "তৃতীয় বিশ্বে' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর উন্নয়ন ধারা, ৫০ ও ৬০ দশকের প্রবৃদ্ধিকেন্দ্রিক উন্নয়ন কৌশল, সবুজ বিপ্লব, ৭০ দশকে পল্লীমুখিনতা এবং ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য ঠেকানোর বিভিন্ন মডেল উদ্ভাবন, উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে 'সাহায্য সংস্থার অবস্থান নির্ধারণ, মৌলিক চাহিদা ও টার্গেট গ্রুপ অ্যাপ্রোজ এ সবই শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী বিশ্বের মাধ্যমে প্রাপ্ত তৃতীয় বিশ্বের সকল 'অনুন্নত' দেশের জন্য সাধারণ অভিজ্ঞতা।" তিনি বাংলাদেশে যুদ্ধপূর্ব এবং পরবর্তী সময়ে কৃষি, শিল্প, জিডিপি ইত্যাদি ক্ষেত্র আলোচনা করে দেখিয়েছেন কিভাবে 'উন্নয়ন' ধারণায় বিভিন্ন মডেল কার্যকর হয়েছে। কুমিল্লা মডেল স্বনির্ভর কর্মসূচি, সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন এবং সবশেষে এনজিও– এসব নিয়েই আলোচিত হয়েছে এ গ্রন্থে।

নির্বাচিত কয়েকটি এনজিও পরিচিতি এ গ্রন্থে মেলে। এই এনজিওগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্র্যাক, প্রশিকা, বাঁচতে শেখা, হিড, জাগরণী চক্র, কেয়ার, রংপুর-দিনাজপুর রুরাল সার্ভিস, সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস, নিজেরা করি, বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতি, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, গণসাহায্য সংস্থা।

এসব সংস্থার কাজের প্রভাব নিয়ে গ্রন্থটিতে বিষদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদে এসব সংস্থার কার্যক্রম অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কি ভূমিকা পালন করতে পারে এবং তৃণমূল পর্যায়ে দরিদ্র জনগণের অবস্থার উন্নয়নে এদের ভূমিকা সম্পর্কে এ গ্রন্থে ব্যাপক আলোচিত হয়েছে।

এই গ্রন্থে লেখক তথ্য, তত্ত্ব পর্যালোচনার মাধ্যমে যে পর্যালোচনা দাঁড় করিয়েছেন তা নিম্নরূপ :

- 'স্বাধীনতা পরবর্তীকালে জিডিপি কতটা বৃদ্ধি পায় তার পেছনে কৃষি শিল্পসহ উৎপাদনশীল খাত প্রধান উপাদান হিসেবে কাজ করেনি। করেছে ব্যবসা-বাণিজ্য, সেবা ও নির্মাণ কাজের বৃদ্ধি।
- বর্তমান গ্রামীণ অর্থনীতিতে কোনো মৌলিক পরিবর্তন নয় শুধু অকৃষি খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ভূমিহীনদের আয়

Dhaka University Institutional Repository

বৃদ্ধি, পরিবার-পরিকল্পনা, শিক্ষা বিস্তার ইত্যাদি কাজও যদি কার্যকরভাবে করতে হয় তাহলে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি হবার কথা। ... ফলে এনজিওগুলো ঋণদান কর্মসূচি, উৎপাদনমূলক কর্মসূচি গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর সাথে স্থিতিবস্থা খাপ খাইয়ে নিয়েছে।

- ক্ষুদ্র ঋণ ও সঞ্চয় এবং আয়বৃদ্ধিকারী প্রকল্পের অর্থনৈতিক ফলাফল হিসেবে দেখা যায়, এতে আয় কিছু বৃদ্ধি ঘটেছে। কিন্তু তা অতিক্রম করতে পারেনি।
- এনজিও সচেতনতা বৃদ্ধির অন্যতম কর্মসূচি সমাজ বিচ্ছিন্ন নয়। বর্তমান রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় একজন ভূমিহীনের সচেতনতা বলতে নিজের অবস্থান বিচ্ছিন্নভাবে বিচার না করে সামগ্রিকভাবে বিচার করা এবং কাজ, জমি, মজুরি, নিরাপত্তা, লিঙ্গীয়, ধর্মীয়, জাতিগত বৈষম্যবিরোধী অবস্থান গ্রহণ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে নিজেদের পক্ষে সংগ্রামে সমষ্টিগতভাবে অংশগ্রহণের উপলব্ধিতেই বোঝা যায়। যেসব অঞ্চলে এনজিওগুলো কাজ করছে সেসব স্থানে কোথাও এর ফল দেখা যাচ্ছে না যে, এনজিও কার্যক্রম শুরু হবার পর সেখানে ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠী রাজনৈতিক সংগ্রামে অধিকতর অংশগ্রহণ করছে। বরঞ্চ বিপরীত ঘটনাই দেখা যাচ্ছে।
- পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য প্রান্তস্থ অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী বিকাশের অপরিহার্য সংকটকে মোকাবেলার জন্য এটি একটি সুপরিকল্পিত সাংগঠনিক প্রক্রিয়া।
- এনজিও কাঠামোকে সচেতনতা বলতে আত্মকেন্দ্রিক হওয়া বোঝায়। সমস্যা সমাধানের সামষ্টিক উদ্যোগের বদলে ব্যক্তির উদ্যোগকে প্রধান করে দেখানো হয়।

ফজলে হাসান আবেদ *(২০০০)* এক প্রবন্ধে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধে তিনি ক্ষুদ্র ঋণকে ক্ষুদ্র অর্থায়ন বলে সংজ্ঞায়িত করেন। ক্ষুদ্র ঋণের বৈশিষ্ট্য, ক্ষুদ্র ঋণের ক্ষেত্র বিস্তৃতি, ব্র্যাক ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি– এসব বিষয়ে আলোকপাত করা হয় এ লেখায়। দারিদ্র্য দূরীকরণ ও নারীর ক্ষমতায়নে ক্ষুদ্র ঋণের প্রভাব কতখানি গুরুত্ব বহন করে তা লেখায় উল্লেখ করা হয়। এর পাশাপাশি বর্তমান সময়ে 'ক্ষুদ্র ঋণ' এবং এর কার্যকারিতা বিষয়ে বিভিন্ন মহলে যে বিতর্ক-প্রশ্ন আছে সেগুলো খণ্ডন করা হয়েছে। বিতর্কগুলোকে খণ্ডনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণের তাৎপর্যকে ইতিবাচক হিসেবে সামনে আনা হয়েছে।

ক্ষুদ্র ঋণের ভবিষ্যত প্রসঙ্গে বলা হয়– এটা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত যে, ক্ষুদ্র অর্থায়ন বাংলাদেশে দারিদ্র্যকে মোকাবেলায় একটি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। এ কর্মসূচি ঋণগ্রহীতাদের অর্থনৈতিক অবস্থায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। একই সাথে এটাও সিদ্ধান্ত টানা হয় যে, দারিদ্র্য একটি জটিল বিষয়। শুধু একটি উদ্যোগে এর সমাধান সম্ভব নয়। এর জন্য বহুমাত্রিক উদ্যোগ দরকার এবং বিস্তৃত কৌশল নির্ধারণ প্রয়োজন। ক্ষুদ্র ঋণ বড় কৌশলের একটা অংশ মাত্র। এটাই একমাত্র নয়। ক্ষুদ্র ঋণ খুব প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করে এবং এর পক্ষে কেবল একটা পর্যায়ের দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব।

তাঁর মতে, নারী ঋণগ্রহীতাদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ আবশ্যকীয়ভাবে প্রভাব ফেলেছে। ঋণ নারীর ক্ষমতায়নেও ভূমিকা রেখেছে। নারীদেরকে দেয়া ঋণ পুরুষদের দেয়ার তুলনায় বেশি কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। নারীদের তার আয়ের ওপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণও এখন বেড়েছে।

মুহাম্মদ ইউনূস *(১৯৮২)* এক কেসস্টাডিনির্ভর গ্রন্থে বিভিন্ন নারীর জীবনী তুলে ধরে দেখান, ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ তাদের জীবনে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে।

গ্রন্থের ভূমিকায় মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, এ দেশে মহিলাদের সঙ্গে কারবার করার চিন্তা ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নেই। বিশেষভাবে গরিব এবং অশিক্ষিত নারীদের জন্য এ সুযোগ একেবারেই বন্ধ। সনাতনি ব্যাংকের নিয়মকে উপেক্ষা করে গড়ে উঠেছে গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প। যেখানে নারী-পুরুষ উভয়কে ঋণ দেয়া হয় এবং দেখা যায়, গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ নিয়ে গরিব মহিলা এবং পুরুষ উভয়ই উপার্জন বাড়াচ্ছেন। কিন্তু নারীদের উপার্জন বৃদ্ধিতে বিশেষ কিছু লক্ষণীয় দিক রয়েছে সেগুলো হলো–

- উপার্জনের টাকায় প্রথম সুফল ভোগ করেন নারীর সন্তানরা। পরিবারের ১ জন সন্তান অন্তত শিক্ষার জন্য স্কুলে যাবার সুযোগ পায়। তার কাপড়-চোপড় জোটে।

Dhaka University Institutional Repository

- দ্বিতীয় সুফল পাওয়া যায় বাসস্থানে। অর্থাৎ ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে নারীর গৃহ সংস্কার বা নির্মাণের কাজে ঋণ খরচ করায় সমগ্র পরিবারে সুফল আসে।

আমিন, রুহুল এবং অন্যান্য (১৯৯৪) তাদের এক গবেষণায় দেখান, গ্রামীণ দরিদ্র নারীরা আয় বৃদ্ধিকারী কর্মসূচিতে যুক্ত হবার ফলে তাদের মধ্যে জন্ম নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গর্ভধারণের হার এবং বহু সন্তান আকাঙ্ক্ষা কমেছে এবং গার্হস্থ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

তারা তাদের গবেষণায় আরো উল্লেখ করেন আয়বৃদ্ধিকারী এসব কর্মসূচি কেবল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নয় শিক্ষাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলেছে এবং এসব কর্মসূচি নারীর ক্ষমতায়নের পথকে প্রশস্ত করতে ভূমিকা রেখেছে বলে তারা গবেষণায় উল্লেখ করেন।

এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ১৯৯২ সালে জাতীয় পর্যায়ের ২২৭৭ জন সদ্য বিবাহিত নারীর ওপর, যারা জামানতমুক্ত ঋণ গ্রহণ করেছে। বৃহৎ ৩টি এনজিও গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক এবং বিআরডিবি'র কর্মসূচির ওপর এবং ১১৬৬ জন নারী, যারা গার্হস্থ্য কর্মের বাইরে কোনো সুবিধা গ্রহণ করেনি।

মুহাম্মদ ইউনূস (২০০৪) এক গ্রন্থে এনজিওদের নারী সদস্যদের ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার, নারীগ্রহীতার অবস্থা এবং নারী কর্মীদের অবস্থা উল্লেখ করেন। তাতে তিনি বলেন, "গ্রামীণ ব্যাংকের আগে বাংলাদেশে ব্যাংকের ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা এক শতাংশের কম ছিল।" এর কারণ হিসেবে সনাতন ব্যাংকিং পদ্ধতিকে অভিযুক্ত করেন। নারীদের ঋণ সুবিধার সুফল হিসেবে তিনি নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ওপর মতামত দেন।

- পুরুষদের তুলনায় নারীরা ঋণের প্রয়োগ করে অনেক দ্রুত আশাতীত পরিবর্তন আনতে পারে।
- অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য যদি হয় জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ ও সর্বপ্রকার বৈষম্য দূর করা, তাহলে স্বাভাবিকভাবে নারীদেরই প্রথম মনোযোগ দেয়া উচিত।

সুলার, সিডনি রুথ এবং সাঈদ এম হাশেমী (১৯৯৪) তাদের গবেষণায় জন্মহারের ওপর নারীর সামাজিক মর্যাদার প্রভাববিষয়ক গবেষণাভিত্তিক ফলাফল উপস্থাপন করেন। গ্রামীণ ঋণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী নারীদের জন্মনিরোধক ব্যবহারের ফলে তাদের সামাজিক মর্যাদা অথবা ক্ষমতায়নের পর্যায় কোন মাত্রায় পৌঁছেছে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। নারীর ক্ষমতায়ন বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে– নারীর চলাফেরা অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা, নিজের জিনিস ক্রয়ের সক্ষমতা, পরিবারের অভ্যন্তরে সহিংসতা ও আধিপত্য থেকে মুক্ততা এবং আইনি সচেতনতা, জনগণের প্রতিরোধ এবং রাজনৈতিক প্রচারণায় অংশগ্রহণ।

১৯৯১ সালের মধ্যভাগে লেখকগণ একটি প্রারম্ভিক জরিপ পরিচালনা করেন ঋণগ্রহীতাদের জন্মনিরোধ গ্রহণের ওপর।

খন্দকার শহীদুল এবং মাহমুদ আব্দুল লতিফ (১৯৯৫) তাদের এক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় জনসংখ্যা পরিবর্তনে ক্ষুদ্র ঋণের প্রভাব আলোচনা করেন। গবেষণায় যে প্রশ্নগুলো উত্থাপিত হয়েছিল সেগুলো হলো– সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি জন্মহার হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষে গ্রামীণ দরিদ্রদের টার্গেট করে ঋণ কর্মসূচি, জন্মনিরোধক ব্যবস্থা ব্যবহারের উন্নয়ন ঘটাতে পারে এবং জন্মহার ও মৃত্যুহার কমাতে পারে।

বাংলাদেশের ৮৭টি গ্রামে গৃহস্থালি তথ্যের জরিপের ভিত্তিতে এই গবেষণা সন্ধান মেলে যে, সরকারি পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি বর্তমান জন্মহার হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে জন্মনিরোধক ব্যবস্থা বৃদ্ধির মাধ্যমে এবং শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে। একই সময়ে ব্র্যাকের 'টার্গেট ঋণ কর্মসূচি' জন্মনিরোধক ব্যবস্থা ব্যবহার বৃদ্ধি করে জন্মহার কমিয়ে এনেছে এবং সর্বোপরি পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি এবং স্বাস্থ্যসেবা

Dhaka University Institutional Repository

নিশ্চিত করেছে। যা হোক, কর্মসংস্থান এবং অর্থ উপার্জনের সুযোগ বৃদ্ধি, বিশেষত নারীদের ক্ষেত্রে পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান হচ্ছে শিশুর মৃত্যুর হার কমানোর স্বল্পমেয়াদি পদক্ষেপ। দীর্ঘমেয়াদি নীতি হচ্ছে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষার উন্নয়ন, যা একই সাথে জন্মনিরোধ বৃদ্ধি এবং শিশু মৃত্যুর হার কমায়।

আনু মুহাম্মদ (১৯৯৭) নারী প্রশ্নের গুরুত্ব, এর ঐতিহাসিক বিকাশ, বর্তমান সময়ে এর অবস্থা ইত্যাদি তার গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। তিনি নারী প্রশ্নকে চিহ্নিত করেন সামাজিক প্রশ্ন হিসেবে। নারী প্রশ্ন বলতে নিছক নারীর অধিকার নয় বরং এটি এমন ক্ষমতা ধারণ করে যা একান্ত ব্যক্তিগত-জীবন-আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে শুরু করে সমগ্র বিশ্ব মানুষের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত সবকিছুকেই রাজনীতির আওতাধীন করে।

সমাজের নানারকম সম্পর্ক, সৃষ্টি ইত্যাদির পরিবর্তনশীলতাকে হিসেবের মধ্যে রেখে নারী প্রশ্নকে বিচার করতে হবে। পরিবর্তনশীলতার মধ্যে উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন ক্রিয়ায় নারী-পুরুষের অবস্থান, শ্রেণীর গঠন, শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর সম্পর্ক, ধর্মের উদ্ভব, ধর্মের প্রভাব, সামাজিক প্রচলিত বিশ্বাস, ধারণা– এসব কিছুর আলোকেই নারী প্রশ্নকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

ইতিহাসে নারীর প্রবেশ ও নারী ঈশ্বরের পতন বিষয়ক আলোচনায় নির্দিষ্ট বিশ্বাস অনুসারীদের মধ্যে কেতাবি ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে ইহুদি, খ্রিষ্টান, মুসলিমদের ভাবনা তুলে ধরা হয়। দেখানো হয় প্রতিটি ধর্মেই মানুষের সৃষ্টির শুরু নারীর অধঃস্তন অবস্থা দিয়ে। পুরুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, ঈশ্বরের বার্তাবাহক, পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব কিংবা শাসনভারের দায় পুরুষের হাতে। আর নারী-পুরুষকে পাপে প্ররোচনাকারী, আদেশ অমান্যকারী, দুর্বল, বিপজ্জনক, পরনির্ভরশীল– ধর্মীয় এই ভাবনাগুলোকে তিনি প্রাচীনকালের পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ধারাবাহিকতা হিসেবে উল্লেখ করেন।

বাস্তব অনুসন্ধান, নৃতাত্ত্বিক ও পুরাতাত্ত্বিক গবেষণায় মানুষের ইতিহাসে দেখা যায়, সমাজে নারী অধঃস্তন ছিল না। এর পক্ষে তিনি ভাস্কর মারলিন স্টোনের *হোয়েন গড ওয়াজ অ্যা ওম্যান* গ্রন্থটি পর্যালোচনা করেন এবং বলেন অনেক রক্তাক্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে নারীর আধিপত্য খর্ব করা হয়েছে এবং অধঃস্তনতা যুক্তিযুক্ত হবার সুযোগ পেয়েছে।

বাংলাদেশে বর্তমান সময়ে নারীর সামাজিক অবস্থান, নারী-পুরুষের কাজের ধরনের মধ্যে কী কী বৈষম্য বিদ্যমান আছে, যা নারীর অধঃস্তনকে টিকিয়ে রেখেছে সেগুলো এসেছে আলোচনায়। ব্যাপক মেহনতি শ্রমজীবী নারী থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত নারী উভয়ই যে নারী হিসেবে পুরুষতন্ত্রের নিপীড়নের শিকার সে বিষয়টি তুলে এনেছেন লেখক এ দেশের পরিপ্রেক্ষিতে। আলোচিত হয়েছে নারী বিষয়ে সমাজে প্রচলিত ভাবনাগুলো কী, ধর্ম ও আইন কিভাবে নারীকে অধঃস্তন করেছে। এ দেশের সমাজ অর্থনীতি পরিবর্তনের সাথে সাথে নারীর অবস্থান, পেশা ইত্যাদির পরিবর্তন কিভাবে হচ্ছে তা দেখতে পাই লেখায়। এনজিও কার্যক্রমে নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নটি আদতে কতটা কার্যকর এ বিষয়ে তিনি মতপ্রকাশ করেছেন এ গ্রন্থে। সবশেষে নারীর ঐক্য, লড়াইয়ের এ মুহূর্তের কর্মসূচি নিয়ে প্রস্তাবনা হাজির করেছেন।

'নারী' প্রশ্নে সামগ্রিক আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি যেসব দিকগুলোর দিকে মূলত গুরুত্বারোপ করেছেন তার কিছু নিম্নে তুলে ধরা হলো :

- যদিও গত কয়েক দশকে 'স্বীকৃত' ও 'দৃষ্টিগ্রাহ্য' অর্থনৈতিক কাজে (মজুরি-শ্রম, পেশাজীবী) মেয়েদের অংশগ্রহণ বেড়েছে তবুও এখন পর্যন্ত বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মেয়েরা অস্বীকৃত ও দৃষ্টিবহির্ভূত কাজেই নিজেদের শ্রমশক্তি ব্যয় করছে। মেয়েদের এসব কাজ 'কাজ' হিসেবে 'পেশা' হিসেবে, 'মূল্য সৃষ্টিকারী' হিসেবে 'অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ' হিসেবে স্বীকৃত নয়।
- দেশে এনজিওর মাধ্যমে ঋণ ও শিক্ষা কর্মসূচি গ্রামীণ মেয়েদের উল্লেখযোগ্য অংশের নিজেদের সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা করবার ক্ষেত্রে একটি প্রভাবকের ভূমিকা পালন করছে। পুরনো অচলায়তনে কিছু চির ধরলেও এর মধ্য দিয়ে মেয়েদের গণ্ডি অতিক্রম, পেশার পরিবর্তন কিংবা সামাজিক শক্তি হিসেবে উঠে দাঁড়ানোর মতো বড় ঘটনা ঘটছে না।

Dhaka University Institutional Repository

- ঋণ কর্মসূচি গ্রামীণ পারিবারিক জীবনে নতুন এক মাত্রা সংযোজন করেছে; কিন্তু এর মাধ্যমেই নারীর জীবনে একটি মৌলিক পরিবর্তন ঘটছে বলে যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হয় বাস্তবে তার প্রতিফলন দেখা যায় না।
- বাংলাদেশে আইনগত কাঠামোয় নারীর অবস্থা এখনও প্রান্তিক। আইনি ব্যবস্থায় নারীকে পূর্ণ ব্যক্তির মর্যাদা দেয়া হয়নি। পারিবারিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় আইনের আধিপত্যই এটিকে শক্তিশালী করেছে।
- তিনটি ক্ষেত্রে নিজেকে ক্ষমতাশীল ভাবার চর্চা নারীর মধ্যে রয়েছে এবং পুরুষরাও এ ভাবনাকে উৎসাহিত করে। এগুলো হলো যৌনতা, সৌন্দর্য, মাতৃত্ব। নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে এ ধারণা নারীকে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি হতে দেয় না।

শামীমা পারভীন (২০০৩) এক প্রবন্ধে নারীর ক্ষমতায়ন প্রশ্নে বলেন, বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন। কেবল মানবেতর অবস্থা থেকে নারীর মুক্তি বা নারীর উন্নয়নের জন্যই নয়, এখন সকল সমস্যার সমাধানে প্রধান ও প্রথম ধাপ হিসেবে নারীর ক্ষমতায়ন প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। তিনি নারীর ক্ষমতায়নের সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে যে, ক্ষমতায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নারী বস্তুগত ও মানবিক সম্পদের ওপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে, পিতৃতন্ত্র ও সফল প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের সফল কাঠামোয় নারীর বিরুদ্ধে জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্যকে চ্যালেঞ্জ বা নারীর ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়ায় যে সকল বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন সেগুলো হলো–

প্রথমত, মতাদর্শ হচ্ছে অন্যান্য ক্ষমতা কাঠামো টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় শক্তি, তাই সচেতনতার স্তর পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয় তার মনে। এ কারণে নারীকে তার নিজ শক্তি, জ্ঞান, বুদ্ধি ও দক্ষতাকে নিজের ভেতর থেকে স্বীকৃতি দেয়া। সর্বোপরি তার যে সম্মানিত হবার অধিকার আছে তা বিশ্বাস করা এবং বুঝতে শেখা যে, তাকে এবং অপর নারীদেরকে এ অধিকার আদায় করতে হবে, কেননা যারা ক্ষমতাধারী তারা স্বেচ্ছায় এ ক্ষমতা দেবে না।

দ্বিতীয়ত, সামাজিক প্রক্রিয়ায় নারী-পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্যকে নারী স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে। তাই বাইরের শক্তির দ্বারা ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এই শক্তির নানারূপ হতে পারে। এর মানে এই নয় যে, তাদেরকে নারী অধিকার কর্মী, নারী সংগঠন বা এনজিও হতে হবে। দরিদ্র নারীদের সংগঠন ও প্রভৃত ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়া নিচের বিষয়গুলোর প্রতি নজর দেন।

- নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কেবল নারীর অবস্থা নয় বরং অবস্থান অর্থাৎ সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদার ক্ষেত্রে পরিবর্তনের দিকে গুরুত্ব দিতে হবে।
- নারীর ক্ষমতায়নের জন্য ব্যক্তি নারীর অবস্থান পরিবর্তন বা বিদ্যমান সমাজের সীমা অতিক্রম করাকে নয়, বরং সমগ্র নারী সমাজের অবস্থান পরিবর্তনের জন্য যৌথ উদ্যোগের ওপরে নির্ভর করতে হবে।
- ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া এমন যেখানে নারী যৌথভাবে নিজের জন্য সময় এবং স্থান তৈরি করে, জীবনকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে পারে ও নয়া সচেতনতা তৈরি করতে পারে। পুরুষের কর্তৃত্ব এবং সংসারের ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে এই স্থান ও সময় নারীকে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করতে শেখায়।

এছাড়া রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য যে প্রস্তাবনাগুলো তিনি হাজির করেছেন সেগুলো হলো :

- নারীর প্রতি বৈষম্যসৃষ্টিকারী আইন পরিবর্তন : সিডও'র অনুমোদন।
- সার্বজনীন পারিবারিক আইনের বাস্তবায়ন।
- প্রচার মাধ্যমে নারীর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টির প্রতিফলন বন্ধ।
- নারীর কাজের স্বীকৃতি, সকল প্রকার কাজে অভিগম্যতা ও গৃহস্থালি কাজে পুরুষের অংশগ্রহণ।
- স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন ধারা অনুসরণ।
- রাজনীতির গণতন্ত্রায়ন।
- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নারীর অভিগম্যতা।

Dhaka University Institutional Repository

কমলা ভাসিন (২০০২) এক গ্রন্থে প্রশ্ন করে নারী বিষয়ে মৌলিক ধারণা পরিষ্কার করতে চেয়েছেন। সুতরাং প্রথমেই আলোচিত হয়েছে 'Gender' প্রত্যয়টি। এবং 'Sex' ও 'Gender'-এর মধ্যকার পার্থক্য। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রেক্ষিতে 'Sex' ও 'Gender'-এর পরিভাষা– প্রাকৃতিক লিঙ্গ ও সামাজিক লিঙ্গ কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। যা আরো সহজে 'Sex' ও 'Gender'-এর অর্থ প্রকাশ করতে সক্ষম। তিনি 'Sex' ও 'Gender'-এর পার্থক্য দেখিয়েছেন এভাবে– Sex প্রাকৃতিক, শারীরিক ক্রিয়া, পুনরুৎপাদন, জননতন্ত্রের সাথে সম্পর্কিত ও অপরিবর্তনীয়। ফলে স্থান নিরপেক্ষ। অপরপক্ষে Gender হচ্ছে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও মানবসৃষ্ট যা মূলত আচরণ, সামাজিক অবস্থান, দায়িত্ব, ক্রিয়া ইত্যাদি নির্দিষ্ট করে এবং তা স্থানভেদে বৈচিত্র্যময়। তিনি দেখিয়েছেন, Gender-এর এই সংজ্ঞায়ন তৈরি হচ্ছে Sex-এর ওপর ভিত্তি করেই। কিন্তু সামাজিক ভূমিকার (Social Role) এই Sex-এর ওপর নির্ভরশীল নয়। যেমন পোশাক, গুণাবলি, সামাজিক ভূমিকা ও দায়িত্ব নারীদের ক্ষেত্রে যেরকম আশা করা হয় তা Sex-এর সাথে খুব অল্প মাত্রায়ই সম্পর্কিত ও নির্ভরশীল। এই বৈষম্যমূলক সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে প্রধান যুক্তি 'নারীর দুর্বলতা'কেও তিনি খণ্ডন করেছেন জীব বৈজ্ঞানিক নানান তথ্য দ্বারা। দেখিয়েছেন, এই বক্তব্যটি যত না যুক্তিসঙ্গত তারও অধিক ধারণাপ্রসূত এবং অতীতকাল থেকে এই ধারণা তৈরি হয়েছে পুরুষতন্ত্রের ভেতর থেকে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমাজ-দার্শনিকবৃন্দও যা সংজ্ঞায়িত করেছেন। কমলা ভাসিন দেখিয়েছেন, কি করে সামাজিকীকরণের নানান প্রতিষ্ঠান নারী-পুরুষদের এই ভিন্ন সামাজিক ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দেয়। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীকে পুরুষ এবং নারীসূচক লেবেল লাগিয়ে দেয়। এই লৈঙ্গিক বিভাজন সামাজিক পরিসর এমনকি ভাষার ক্ষেত্রেও স্পষ্টভাবে রয়েছে।

কমলা ভাসিন তার গ্রন্থে এই বিভাজনের কারণ 'পুরুষতন্ত্র'কে চিহ্নিত করেছেন। তার একটি স্পষ্ট রূপরেখা নির্মাণের চেষ্টা করেছেন। পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্য, উৎপাদন যন্ত্রের ওপর দখল, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বময় ক্ষমতা, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাও আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, শিক্ষা, আধুনিকতা অথবা উন্নয়নের কারণে নারী-পুরুষের এই বৈষম্য সৃষ্টি হয়নি। বরং ইতিহাসের অতল গহ্বরেও এই বৈষম্য বিরাজমান ছিল। আর আজকের এই বৈষম্য তারই ধারাবাহিকতা। Gender শুধু নারী-পুরুষের সামাজিক ভূমিকাই নির্ধারণ করে না বরং তাদের মধ্যকার সম্পর্কও নির্ধারণ করে। পরিবারে নারীর ভূমিকা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ক্ষমতা সবই নির্দিষ্ট হয় Gender দ্বারা। অন্য সকল পরিচয় ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী ইত্যাদির চেয়ে এই লিঙ্গ বৈষম্য প্রাথমিক ও প্রধান। তিনি তার গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন শ্রমের লৈঙ্গিক বিভাজনের ওপর– উৎপাদন, পুনরুৎপাদন ও সামাজিক নানান ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের শ্রম বিভাজনের বিষয়ে। অনেকে এই সামাজিক ভূমিকাগুলোকে প্রাকৃতিক মনে করেন যেহেতু নারীরা সন্তান জন্মাদন করেন ও শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ান। তিনি দেখিয়েছেন, কত অল্প সম্পর্ক রয়েছে এর সাথে পুরো নারীর সমাজ দ্বারা নির্ধারিত নির্দিষ্ট ভূমিকার। তিনি প্রশ্ন ও চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছেন, নারী-পুরুষের ঘর-বাহির বিভাজনের প্রতিও। আলোচনা করেছেন, গৃহস্থ নির্যাতনের, বৈষম্য ও সংঘাতের বিষয়ে। দেখিয়েছেন, কীভাবে গৃহ অভ্যন্তরে শোষণ, নিপীড়ন, পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য ও বঞ্চনা কাজ করে।

এসব নারী-পুরুষ বৈষম্য ও নিপীড়নের দিকে আলোকপাত করে তিনি প্রতি মুহূর্তে লড়াইয়ের প্রশ্নটি সামনে এনেছেন। আহ্বান জানিয়েছেন, বৈশ্বিক লড়াইয়ের। সামাজিক লিঙ্গ ও উন্নয়নের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিশ্বব্যাপী লিঙ্গ বৈষম্যবিরোধী নানান সংগ্রাম, নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক সুযোগ-সুবিধা তৈরি এবং কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত ইত্যাদি বিষয়ে নানান উন্নয়ন কর্মসূচি ও তৎপরতার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। সবশেষে তিনি বলেছেন, এই লড়াই, সংগ্রাম শুধু নারী অথবা শুধু পুরুষের নয়। নারী-পুরুষের মিলিত সংগ্রামই এই পুরুষতন্ত্রকে উচ্ছেদ করতে সক্ষম হবে। নারী যেহেতু গৃহে থাকে, তার জায়গা চাই রাজগৃহে। রাজনীতি, রাষ্ট্রক্ষমতা, প্রশাসন সর্বত্রই প্রয়োজন নারীর অংশগ্রহণ। ক্ষুদ্র পরিসরে এই সকল বিষয়ের বিস্তৃতিকে বিবরণ করেছে কমলা ভাসিন।

মেঘনা গুহ ঠাকুরতা এবং সুরাইয়া বেগম (১৯৯৫) এক যৌথ গ্রন্থে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং নারী আন্দোলন বিষয়ক প্রবন্ধে নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন। তাদের মতে, ক্ষমতায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া, যা ক্ষমতা এবং উন্নয়নের আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে কিছু মৌলিক ধারণাকে প্রশ্ন করে। এখানে ক্ষমতায়ন বলতে অন্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা নয়, বরং নারীর নিজস্ব ক্ষমতা বৃদ্ধির ও স্বনির্ভরতাকে বোঝানো হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন বা স্বনির্ভরতার মাত্রা হয় নারী তার জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বিকল্পগুলো গ্রহণ করতে পেরেছে কিনা এবং

Dhaka University Institutional Repository

উৎপাদন ও সম্পদের ওপর তার অংশীদারিত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারছে কিনা। নারী তার জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারছে কিনা এসব কিছুর ওপরই নির্ভর করে ক্ষমতায়নের বিষয়টি।

এই প্রবন্ধে নারীর ক্ষমতায়নের সাথে জড়িয়ে থাকা এনজিও কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়। যার মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, গ্রামীণ ঋণ ও আয়বৃদ্ধি, শিক্ষা ও সাক্ষরতা কর্মসূচি এবং সচেতনতা ও দক্ষতার প্রশিক্ষণ। তাদের লেখায় নিম্নোক্ত মতামত পাওয়া যায়।

- দাবি করা হয় যে, এনজিওদের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যাই বেশি। এই তথ্যটি রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দিক থেকে একটা নির্দেশক হতে পারে যে, নারী তার নিজের শরীরের ওপর নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে না অথবা বিদ্যমান অধঃস্তনতার সম্পর্কের কারণে পুরুষ জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহারে আগ্রহী হয় না।
- গ্রামীণ কর্মসূচির মাধমে আয় সৃষ্টি বাংলাদেশের কয়েকটি বৃহৎ এনজিও কর্তৃক প্রবর্তিত আয়বৃদ্ধির অন্যতম একটি পুরনো পদ্ধতি। নানা ধরনের সমালোচনা সত্ত্বেও তৃণমূল পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতার অঙ্গনে প্রবেশের এখনও পর্যন্ত অন্যতম প্রশস্ত পথ।
- তারা তাদের লেখায় এও উল্লেখ করেন যে, সচেতনতা সৃষ্টি ও দক্ষতা সৃষ্টির প্রশিক্ষণ এনজিওদের পরিশ্রমসাধ্য কর্মসূচি। এই কর্মসূচি নারীকে স্বাধীন ও স্বনির্ভর হতে সহায়তা করেছে।

বর্তমান গবেষণায় বিভিন্ন প্রকাশনা পর্যালোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে এ যাবৎ যারা এনজিওর ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা, এনজিওর কর্মসূচি, নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে কাজ করেছেন তাদের লেখা। এছাড়া এনজিওসমূহের মতাদর্শিক অবস্থা বোঝার চেষ্টা হয়েছে এনজিও প্রতিনিধিত্বকারীদের লেখার মাধ্যমে। লেখায় এনজিওর কর্মসূচি, ব্যবহারিক প্রয়োগ– এসব সম্পর্কে ভিন্ন মতাবলম্বীদের মতামত, যুক্তি এবং বিভিন্ন তর্কের মূল দিকগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এসব বিষয়ে সামগ্রিক পর্যালোচনায় সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃ | তী | য় | অ | ধ্যা | য়

বাংলাদেশ এনজিও ও নারীর অবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে এনজিও ও নারীর অবস্থা

বাংলাদেশে এনজিওর অবস্থা এবং নারীর অবস্থার বর্তমান রূপ বোঝা গবেষণার জন্য জরুরি। তাই এ দুটি বিষয় নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা করা হলো এ অধ্যায়ে।

বাংলাদেশে এনজিওর অবস্থা

বাংলাদেশে সত্তরের দশকের পর থেকে এনজিও বা নন-গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন নানা উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে তৎপরতা শুরু করে। এনজিও বলতে শাব্দিক অর্থে যে বেসরকারি সংস্থাকে বোঝায় তার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। আমরা বর্তমান গবেষণায় ওইসব বেসরকারি সংস্থার প্রশাসনিক কাঠামো ও কার্যক্রমের দিকগুলোতে মনোযোগ নিবিষ্ট করেছি যেগুলো দারিদ্র্যবিমোচন এবং নারীর ক্ষমতায়ন অথবা নারী-পুরুষের সমতা আনয়নের লক্ষ্যে নিজেদের তৎপরতা চালাচ্ছে। এসব সংস্থা তাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে মূলত বিভিন্ন শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশ, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অনুদানের ওপর নির্ভর করে। বেসরকারি সংস্থা হয়েও এসব সংস্থা সরকারি অনুমোদনের মাধ্যমেই কাজ করে থাকে।

যুদ্ধোত্তর সময়ে প্রাথমিকভাবে ত্রাণ তৎপরতা যার মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ, কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ও উৎপাদন উপকরণ সরবরাহ ইত্যাদি এর কর্মসূচিতে গুরুত্ব পায়। পরবর্তীতে এই কার্যক্রম আরো সম্প্রসারিত হয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা কার্যক্রম, গণসচেতনতা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ঋণ, নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান, আইনি অধিকার, নারী-পুরুষের সম্পর্কে সমতা আনয়ন ইত্যাদি বিষয়ের সাথে যুক্ত হয়। ৯০ দশকে এনজিও কার্যক্রমে দরিদ্র নারীর উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয় মনোযোগের কেন্দ্রে আসে।

বর্তমানে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক, জাতীয়, স্থানীয় ও সেবাপ্রদানকারী এই চার ধরনের এনজিওর সংখ্যা প্রায় সহস্রাধিক। এদের মধ্যে দুই শতাধিক উল্লেখযোগ্য। নারী ক্ষমতায়নের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে নারীদের টার্গেট গ্রুপ হিসেবে যেসব এনজিও কাজ করছে তার মধ্যে ব্র্যাক, প্রশিকা, আশা, আইন সালিশ কেন্দ্র, নারী প্রগতি সংঘ, নারী পক্ষ, নাগরিক উদ্যোগ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এসব সংস্থা 'ফরেন ডোনেশন ভলান্টারি এক্টিভিটি রেগুলেশন অর্ডিন্যান্স-১৯৭৮'-এর আওতায় সমাজ কল্যাণ বিভাগের রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত। এসব সংস্থা তহবিল পায় বৈদেশিক সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে। যেসব সংস্থা থেকে সাধারণত এসব সংস্থা অনুদান পায় সেগুলো হলো– ইউরোপিয়ান কমিশন, সিডা, বোডা, নোয়াড, নোভিড, ডিজিআইএস (নেদারল্যান্ড), ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম (ডব্লিউএফপি), দি ফোর্ড ফাউন্ডেশন, ডেনিডা, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, এডিবি, ডিএফআইডি, ক্রিশ্চিয়ান এইড, ইউএস এইড, অক্সফাম, ইউনিসেফ ইত্যাদি।

এ দেশে এনজিওর কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নারীর অবস্থানের পরিবর্তন কতটুকু হয়েছে এ বিষয়ে বোঝার জন্য প্রথমেই নারীর বিদ্যমান অবস্থা এই রাষ্ট্র কাঠামোতে কোন পর্যায়ে রয়েছে সেই বিষয়টি লক্ষ্য করতে হবে। নিচে এ বিষয়ে উল্লেখ করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে গ্রাম-শহর সর্বত্র সাধারণভাবে নারী এবং বিশেষভাবে বিপুল দরিদ্র শ্রমজীবী নারীর অধঃস্তন অবস্থার পেছনে রয়েছে সামাজিক-রাজনৈতিক-রাষ্ট্রীয় বৈষম্য। সামাজিকভাবে নারীর কতটুকু অধিকার-করণীয় এসব বিষয়ে এমনসব ধারণা পরিবার, বিদ্যালয়, ধর্মীয় প্রচারণা, সমাজ-রাষ্ট্র থেকে পাওয়া যায়, যা বিশেষ ভূমিকা রাখছে নারীকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ক্ষেত্রে। এসব সামাজিক ধারণা ও প্রচারণা নিপীড়িত প্রান্তিক নারীদের পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে সমাজ-রাষ্ট্রের প্রতি তার করণীয় এবং অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার বদলে উপস্থিত করে কেবল পুনরুৎপাদনের বস্তু, শারিরীকভাবে দুর্বল, চিন্তায় অক্ষম, পুরুষের সহযোগী, সহযাত্রী, উৎসাহদাত্রী, ভোগ্য পণ্য হিসেবে। নারীর বৈশিষ্ট্য হিসেবে এসব উপাদানকে নির্ধারিত করার জন্য রাষ্ট্রের আরো যে বড় হাতিয়ার কাজ করে তা হলো ধর্ম। শুধু বাংলাদেশেই নয় সর্বত্র সব ধর্মেই চেষ্টা আছে নারী যে পুরুষের অধঃস্তন সেটা প্রমাণের। ধর্মীয়ভাবে নিপীড়নের পাশাপাশি অব্যাহত আছে সংখ্যালঘু জাতি গোষ্ঠী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষের ওপর সহিংসতা ও নিপীড়ন। বিশেষভাবে নারীর ওপর এই নির্যাতনের মাত্রা অত্যাধিক।

বাংলাদেশের সংবিধানে শ্রেণী, ধর্ম, বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল নারী-পুরুষের সমান অধিকার ইত্যাদি বক্তব্য থাকলেও বাস্তবত চালু আছে বৈষম্যমূলক সবরকম আইন। সংবিধানের বক্তব্যের আড়ালে মূলত রয়েছে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠীর বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, সন্তানের অধিকার বিষয়ে সবরকম বৈষম্যমূলক আইন। এসব আইনের মধ্য দিয়ে নারীর ওপর বৈষম্যের ভিতই আরো মজবুত হয়েছে।

যৌতুকের কারণে নির্যাতনের শিকার হয় প্রতিবছর লক্ষ নারী। যৌতুক নিরোধে বাংলাদেশে আইন করা এবং এনজিওদের এর বিরোধী প্রচারণা ও তৎপরতা থাকলেও এখন পর্যন্ত যৌতুককেন্দ্রিক নির্যাতনের হার এবং যৌতুক প্রদান কমেনি। এর বাইরে পর্দা, নারী-পুরুষের প্রেমের সম্পর্ক, বিধবার জীবন আচরণ, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে গ্রামে-গঞ্জে যেভাবে সালিশ প্রক্রিয়া বিদ্যমান তাতে করে বোঝা যায়, এখনও এ দেশের সংস্কৃতিতে সামন্তাবশেষ টিকে আছে। এ কারণেই অহরহ ঘটছে ফতোয়া জারি, দোররা মারা, মাটিতে পুঁতে পাথর নিক্ষেপের মতো ভয়াবহ নির্যাতনের ঘটনা। এসব নির্যাতনের পাশাপাশি রয়েছে এসিড নিক্ষেপ, নারী পাচার, অপহরণ, হত্যা, যৌন নিপীড়ন, ধর্ষণের মতো নৃশংস ঘটনা। বর্তমানে গ্রামীণ সালিশ প্রক্রিয়াকে অধিক গণতন্ত্রায়নের লক্ষ্যে এনজিও তৎপরতা দেখা যায়।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ তৎপরতার মধ্য দিয়েও নারীর অধঃস্তন অবস্থা বোঝা যায়। গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক দরিদ্র শ্রমজীবী নারীরা যুক্ত আছে কৃষিকাজ, পশুপালন, ক্ষুদ্র শিল্পে যেমন– তাঁত চালানো, সুতা তৈরি, কুমারের কাজ, নকশী কাঁথা-কাপড় তৈরি, বাঁশ ও বেতের জিনিস তৈরি ইত্যাদি বাজারের সাথে সম্পর্কিত নানা কাজে। কোনো না কোনোভাবে এসব কাজ বাজারে মূল্য তৈরি করলেও অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে এসবের কোনো স্বীকৃতি নেই।

গ্রাম থেকে উচ্ছেদ হওয়া বহু নারী বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে কর্মসংস্থানের আশায় ভিড় জমিয়েছে। তাদের একটা বড় অংশ কাজ করছে গার্মেন্টসসহ ছোট শিল্প যেমন– প্লাস্টিক কারখানা, চুড়ির কারখানা, জুতার কারখানা, ইট ভাঙা, মাটিকাটা, সুপারি কাটা, হোটেলের কাজ, ছোট দোকানদারি, কাজের 'বুয়া' ইত্যাদি নানা ধরনের পেশায়। এসব পেশার মধ্যে গার্মেন্টস শিল্পে নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। প্রায় ২০ লাখ নারী শ্রমিক এ পেশায় জড়িত আছে। সস্তায় পাওয়া যায় বলে মালিকপক্ষ নারীদেরই এই পেশার জন্য বেছে নিয়েছে অধিকমাত্রায়। এদের নির্দিষ্ট কোন শ্রমঘণ্টা নেই, কাজ করতে হয় প্রায় ১৫/১৬ ঘণ্টা। কাজের নিশ্চয়তা নেই, সাপ্তাহিক-সরকারি বা মাতৃত্বকালীন ছুটির বালাই নেই, নেই সঠিক ওভারটাইম। তারা যাপন করছে এক মানবেতর জীবন।

শ্রমজীবী নারীদের পাশে মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত, অর্ধশিক্ষিত বা শিক্ষিত নারীরা বেছে নিচ্ছে অপেক্ষাকৃত ঝুঁকিহীন পেশা যেমন– শিক্ষকতা, রিসিপশনিস্ট, সেলস গার্ল, বিউটিশিয়ান, অপারেটর ইত্যাদি। বাংলাদেশে পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের প্রভাবের কারণে নারীরা আগের তুলনায় অধিকমাত্রায় যুক্ত হচ্ছে দৃশ্য মাধ্যমে– মডেলিংসহ অন্যান্য পেশায়। চিন্তা-কাজে প্রত্যেক নারী নিজেকে সজ্জিত করছে পুঁজি ও পণ্য সংস্কৃতির ইচ্ছা অনুযায়ী। এসব পেশার বাইরে রাষ্ট্রীয় আইনে স্বীকৃত কিন্তু সবচেয়ে নিন্দিত পেশা হিসেবে রয়েছে পতিতাবৃত্তি। এ পেশার নারীরা সমাজ এবং রাষ্ট্র থেকে নিগৃহীত অবস্থায় থাকে। রাষ্ট্রীয় পুলিশ থেকে শুরু করে ক্রেতা– কারো নিপীড়নের হাত থেকেই এরা রেহাই পায় না।

Dhaka University Institutional Repository

'উন্নয়ন বা সেবামূলক' সংস্থা এনজিওর মাধ্যমে গ্রামে নারী গৃহকর্মের বাইরে অন্য কাজে অংশগ্রহণ বেড়েছে। ফলে এনজিওর ক্ষুদ্র ঋণসহ নানা অর্থনৈতিক কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণ দেখা যায়। এনজিওরা দরিদ্র নারীর উন্নয়ন, আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীর ক্ষমতায়নের বিষয় নিয়ে কাজ করছে। কিন্তু এতে নারীর সামাজিক অবস্থান এবং ক্ষমতায়নের প্রশ্নটি কতটা সামনে এসেছে তা আলোচনাসাপেক্ষ।

এনজিও নারী ক্ষমতায়নের প্রতিশ্রুতি নিয়ে কাজ করছে। এনজিও প্রশাসনে বহুসংখ্যক নারী নিয়োজিত আছে। বহুসংখ্যক শ্রমজীবি নারী এনজিওর ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিসহ নানা কর্মসূচিতে যোগদান করে বাজারে নতুন পুঁজির সঞ্চালন সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় নারীর অধঃস্তনতা কতটা দূর হচ্ছে তা এখনো গবেষণাসাপেক্ষ।

বাংলাদেশে নারীর অধঃস্তন অবস্থার যে চিত্র উল্লেখ করা হলো তার কারণ সম্পর্কে শিক্ষার অভাব, দারিদ্র্য, সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা ইত্যাদিকে দেখানোর চেষ্টা আমরা বিভিন্ন মহল থেকে দেখি। এও লক্ষ্য করা যায়, নারীর অবস্থা টিকে থাকার পেছনে রাষ্ট্রীয় নীতি কি ভূমিকা রাখছে সে বিষয়টি প্রায়শই অনালোচিত বা কৌশলগতভাবে এড়ানোর চেষ্টা থাকে। কিন্তু কোনো দেশের নারীর অবস্থা বোঝার জন্য সে দেশের রাষ্ট্রীয় নীতিমালা, মতাদর্শ পর্যালোচনা জরুরি। এই পর্যালোচনা গবেষণার শেষভাগে করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

চ | তু | র্থ | অ | ধ্যা | য়

নমুনা হিসেবে গৃহীত ৩টি এনজিওর পরিচিতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

Dhaka University Institutional Repository

নমুনা হিসেবে গৃহীত ৩টি এনজিওর পরিচিতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এনজিও প্রশাসন ও কার্যক্রমে নারীর অবস্থা বিষয়ে গবেষণার জন্য প্রথমে নির্দিষ্ট এনজিও পরিচিতি ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য জানা জরুরি। যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট এনজিওর কার্যক্রম, ইতিহাস, সামগ্রিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। একই সাথে এসব সংস্থার লক্ষ্য, উদ্দেশ্যের সাথে গবেষণার বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতার দিকটিও উঠে আসে। গবেষণার জন্য নির্দিষ্ট তিনটি এনজিও– ব্র্যাক, প্রশিকা, নাগরিক উদ্যোগ-এর পরিচিতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিচে তুলে ধরা হয়েছে।

ব্র্যাক

ব্র্যাক একটি জাতীয়ভিত্তিক ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। ২০০৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে ব্র্যাক তার সংক্ষিপ্ত নামের পূর্ণ পরিচয় হিসেবে 'বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি' ব্যবহার করেছে। কিন্তু ২০০৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা যায় পূর্ণ পরিচয় বাদ দিয়ে 'ব্র্যাক' ব্র্যান্ড আকারে তার পরিচয় হাজির করে। দারিদ্র্যসহায়ক সংগঠন হিসেবে পরিচিত ব্র্যাকের পূর্ণ পরিচয় বাদ দেয়ার কারণ জানতে চাইলে নেতৃত্বরা জানান, বর্তমানে শতকরা ৩০ ভাগ দরিদ্র শহরে থাকে। শুধু গ্রামীণ নয়, শহুরে দরিদ্রদের জন্যও এ সংস্থাটি কাজ করছে। এছাড়া ব্র্যাক সংক্ষিপ্ত নামেই এখন অধিক পরিচিত। নামের এ ধরনের রূপান্তরের পেছনে ব্র্যাকের বর্তমান চরিত্র লক্ষ্য করা দরকার। এ সংস্থাটি প্রথমে দরিদ্রদের সহায়ক কার্যক্রম দিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে তার কার্যক্রমে সহায়ক হিসেবে বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান দাঁড় করিয়েছে। যেমন– আড়ং, ব্র্যাক ডেইরি, ব্র্যাক কনকর্ড টাওয়ার, ব্র্যাক ব্যাংক, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি। ফলে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর পেছনে 'বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি' নামটি যুক্ত করা বেমানান হয়ে পড়েছে।

১৯৭২ সালে ফজলে হাসান আবেদ এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি যাত্রা শুরু করে 'যুদ্ধোত্তর জরুরি ও তাৎক্ষণিক সাহায্য এবং ভারত থেকে আগত রিফিউজিদের পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠা' লক্ষ্যকে সামনে রেখে সিলেটের শল্লা থেকে। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটি দেশে এবং বিশ্বের বৃহত্তম এনজিও হিসেবে পরিচিত। প্রাথমিকভাবে 'যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ত্রাণ কার্যক্রমে'র নামে কাজ শুরু করলেও কিছুদিনের মধ্যেই এটি মনোযোগ দেয় বাংলাদেশের গ্রামীণ অঞ্চলে 'দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং দরিদ্র বিশেষভাবে দরিদ্র নারীর ক্ষমতায়ন ইস্যুতে'।

বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা– ব্র্যাকের এ মূল ৩টি কার্যক্রম বিস্তৃত আছে। এই কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে– ১. ব্র্যাক অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি, ২. ব্র্যাক সামাজিক উন্নয়ন, মানবাধিকার এবং আইন সহায়তা কার্যক্রম, ৩. স্বাস্থ্য কার্যক্রম, ৪. শিক্ষা কার্যক্রম ও ৫. সহায়ক কার্যক্রম। দেশের বাইরে আছে ব্র্যাক আফগানিস্তান, এর আওতায় আছে– শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্ষুদ্র অর্থায়ন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, কৃষি, আন্তর্জাতিক সংহতি, নারী প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচি ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

গোটা বাংলাদেশে ব্র্যাকের ২০০৩ সাল পর্যন্ত মোট ৬১,৯২৪টি গ্রামে ২৮ হাজার নিয়মিত কর্মচারী এবং ৩৪ হাজার পার্টটাইম শিক্ষক কাজ করেছে। ব্র্যাকের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৪-এ অনুযায়ী নিয়মিত কর্মচারী ৩২ হাজার ৬শ' ৫২ জন। তার মধ্যে নারী ৬৭৫৬ জন, বাকি পুরুষ। নিয়মিত কর্মীর বাইরে স্কুল শিক্ষক ৬৫,৪১২ জন, স্থানীয় এলাকা স্বাস্থ্য স্বেচ্ছাসেবক ২৯,৭২৬ জন, স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবিকা ২,২৮৪ জন, পোল্ট্রি কর্মী ৫০ জন, ৮০৫ জন, কমিউনিটি পুষ্টি কর্মী ১১,৯৮৮ জন, পুষ্টিবিষয়ক নারী সদস্য ১,১৯,৬৮৫ জন। (ব্র্যাক, ২০০৪)

নব্বই দশক পর্যন্ত ব্র্যাকের প্রধান ৩টি কার্যক্রম বড় অংশে পরিচালিত হয়েছে বিদেশী সাহায্য সংস্থার মাধ্যমে। এর অর্থায়ন করেছে আগা খান ফাউন্ডেশন, কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (CIDA), দ্য সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (SIDA), ব্রিটিশ ওভারসিস ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (BODA), নেদারল্যান্ড অর্গানাইজেশন ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন (NOVIB), ইজেডই অব জার্মানি, দ্য রয়েল নরওয়েজিয়ান অ্যামবাসি, দ্য ফোর্ড ফাউন্ডেশন, ডেনিডা এবং কমিশন অব ইউরোপিয়ান কমিউনিটি। (খন্দকার, খলিলি এবং খান ১৯৯৫, ১৫৭)

১৯৮৬-৮৯ এ পর্বে ব্র্যাককে অর্থায়ন করেছে ইজেডই, নোরাড এবং নোভিড। নব্বই দশকের মাঝামাঝি থেকে ব্র্যাকে অনুদানের পরিমাণ কমতে থাকে। অভ্যন্তরীণ খাত থেকেই বর্তমানে ব্র্যাকের বাজেটের ৭৭% অংশ খরচ হয়। ১৯৯৮ সালে অনুদানের পরিমাণ ছিল ৩২%। ২০০৩ সালে অনুদান ছিল বাজেটের ২০%। বর্তমানে সবচেয়ে বেশি অনুদান প্রাপ্তি ঘটে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অতি দরিদ্র কর্মসূচিতে। গতবছর ব্র্যাকের বাৎসরিক মোট খরচ ১৪,৪৮৭ মিলিয়ন টাকা, ইউএস ডলার ২৪৫ মিলিয়ন। এর মধ্যে অনুদান ২৩%। বাকি ৭৭% অভ্যন্তরীণ আয়। গতবছর ব্র্যাকের প্রধান ডোনার সংস্থা হলো : ইউরোপিয়ান কমিশন, ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউ.কে), ডিজিআইএস (নেদারল্যান্ড), নোরাড (নরওয়ে), ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম (ডাব্লিউএফপি)। (ব্র্যাক, ২০০৪)

জেলা, উপজেলা, গ্রাম-শহরভিত্তিক ৩টি এনজিওর কাজের অঞ্চল

	ব্র্যাক	প্রশিকা	নাগরিক উদ্যোগ
জেলা	৬৪	৫৭	৪
উপজেলা	৪৮০	২৬৭	৪
গ্রাম	৬৮,৪০৮	২৩,৪৩০	
শহর	৪,৩৭৮	২৯০১	

সূত্র : ব্র্যাক-২০০৪, প্রশিকা-২০০৪, নাগরিক উদ্যোগ-২০০৪

ব্র্যাকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- গ্রামীণ দরিদ্র অসহায় বঞ্চিত নারীদের দারিদ্র্য দূরীকরণ ও ক্ষমতায়ন।
- জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং মানবিক ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জেন্ডার সমতা আনয়ন।
- মানবাধিকার নিশ্চিত করা।
- আইনি সহায়তা প্রদান।
- স্বাস্থ্য বিষয়ে জনগণকে সচেতন করা।
- জনগণের প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা।

গ্রামীণ নারীদের মধ্যে 'গ্রাম সংগঠন' গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নিজেদের নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা ব্র্যাকের কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম। ব্র্যাকের অর্থনৈতিক কর্মসূচির আওতায় রয়েছে প্রায় ৪৭ লাখ ভূমিহীন নারী। বিশেষভাবে নারীদের মধ্যে রয়েছে ১,১৯,৮৩৬টি গ্রামীণ সংগঠন (VOS)। প্রত্যেকটি গ্রামীণ সংগঠন ৩০-৪০ জন সদস্যের মাধ্যমে গঠিত। এই দলগুলো একেকটা ফোরাম হিসেবে কাজ করে। এই দলের সদস্যদের মধ্যে ব্র্যাক

Dhaka University Institutional Repository

ঋণ কর্মসূচিসহ ও অন্য সকল সচেতনতামূলক কর্মসূচি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান করে। এই গ্রামীণ সংগঠনে সদস্যরা 'জামানতবিহীন'ভাবে অর্থাৎ ব্র্যাকের সঞ্চয়ী হিসাব খোলার পরে ঋণ নিতে পারে। ঋণ নেয়ার সময় তারা সঞ্চয়ী হিসাবের টাকা বিশেষ অবস্থায় তোলার নিয়ম থাকলেও সাধারণত তুলতে পারেন না। যদিও ২০০৪ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে ব্র্যাকের গ্রামীণ সংগঠন মোট ১,৪২,১১৭টি। এই সংগঠনগুলোতে মোট সদস্য ৪,৮৫৮,৭৬৩ জন। এর মধ্যে নারী সদস্য ৪,৭২৭,২৮৬ এবং পুরুষ সদস্য ১৩১,৪৭৭জন। এরা জামানত ছাড়া সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে পারে।

যদিও ব্র্যাক মনে করে, ক্ষুদ্র ঋণ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রকে ভাঙার জন্য একটি মজবুত হাতিয়ার, তারপরও এটি সমান গুরুত্ব দেয় তাদের সদস্যদের আয় সৃষ্টিকারী কাজে এবং পণ্য বাজারের সাথে তাদের যোগাযোগ সহজ করার প্রশিক্ষণের ওপর। ব্র্যাক ১৯৭৬ সালে ১০৭,৩১০ মিলিয়ন ২১৫০ টাকা ব্যয় করে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির উদ্যোগ নেয়, যেখানে ঋণ পুনঃউদ্ধারের পরিমাণ ছিল প্রায় ৯৮%। ব্র্যাকের সঞ্চয়ী হিসাবে বর্তমানে জমা আছে ৬,২৮৫ মিলিয়ন টাকা। মাথাপিছু ঋণের হার ৬৮৭৯ টাকা, যেখানে কোনো জামানতের প্রয়োজন নেই। ব্র্যাক বহুসংখ্যক সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি সংগঠিত করেছে, যা গঠিত হয়েছে সদস্যেদের নিজেদের অধিকার এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এবং তাদের গ্রামের মধ্যকার বৈষম্যের ইস্যুগুলোকে তোলার কাজকে সহজ করার জন্য। অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাইরে ব্র্যাকের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হলো–

ব্র্যাক শিক্ষা কার্যক্রম : যার মধ্যে রয়েছে শিশু শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান, কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রশিক্ষণ। এসব কর্মসূচিতে নারী ছাত্রদের সংখ্যাই বেশি। শিক্ষকদের মধ্যে সকলে নারী।

ব্র্যাক স্বাস্থ্য কার্যক্রম : এর আওতায় রয়েছে মাতৃত্বজনিত রোগ ও শিশু মৃত্যুর হার কমানোর কার্যক্রম ও ডায়রিয়া, যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ, গর্ভবতী নারীদের চেকআপ, পরিবার পরিকল্পনা, জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতন করা, নিরাপদ পানি ও হাইজিন স্যানিটারি বিষয়ে জনগণকে আগ্রহী করা।

ব্র্যাক সামাজিক কার্যক্রম : এর আওতায় রয়েছে গ্রামসভা, ইউনিয়ন সমাজ, পল্লী সমাজ, নারীর ক্ষমতা বৃদ্ধি, পপুলার থিয়েটার, আইনি সহায়তা, স্থানীয় নেতৃত্ব তৈরি ইত্যাদির মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম। এই কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ, যৌতুক, বহুগামিতা, স্থানীয় পর্যায়ে দুর্নীতি বিরোধিতা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি পালন করা হয়। স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব গঠনের লক্ষ্যে কর্মশালায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, স্থানীয় কাজী, ইমাম, শিক্ষক, সাংবাদিক, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিয়ে সামাজিক সচেতনতামূলক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এই কর্মশালায় আরো উপস্থিত থাকেন সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি সংগঠক এবং অঞ্চল সংগঠক।

৩টি এনজিওর গ্রাম সংগঠন

	ব্র্যাক		প্রশিকা		নাগরিক উদ্যোগ	
গ্রাম সংগঠন	১,৪২,.১১৭		১,৪৫,৭৩৬		২,৮৮৯	
সদস্য	৪৮,৫৪,৭৬৩		২৭,৩৩,৬২৪		---	
	নারী ৪৭,২৭,২৮৬	পুরুষ ১,৩১,৪৭৭	নারী ১৬,৯০,৬৮২	পুরুষ ১০,৪২,৯৪২	নারী --	পুরুষ --

সূত্র : ব্র্যাক-২০০৪, প্রশিকা-২০০৪, নাগরিক উদ্যোগ-২০০৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রশিকা

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র বাংলাদেশের একটি বৃহৎ এনজিও। ঢাকা এবং কুমিল্লা জেলায় কানাডিয়ান সিডার আর্থিক সহায়তায় এটি অল্প কিছু গ্রামে তার কাজ শুরু করে ১৯৭৫ সালে। যদিও সংগঠিত আকারে এর কাজ শুরু হয় ১৯৭৬ সালে।

প্রশিকার ২০০২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে চার্টার্ড একাউন্টেন্ট খান জাহান বলেন, 'বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণ দারিদ্র্যের কষাঘাতে অমানবিক অবস্থায় জীবনযাপন করছে, যার ফলাফল হিসেবে দেখা যাচ্ছে তারা সুযোগ বঞ্চিত, উৎপাদনশীল সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণহীন, বাজারের সাথে সম্পর্কহীন, অংশগ্রহণ কম, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা লিঙ্গ বৈষম্য, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি অবস্থায় রয়েছে।' এই সমস্যাকে শনাক্ত করে বাংলাদেশে উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে পরিচিত জাতীয়ভিত্তিক সংস্থা প্রশিকা তার কাজের প্রধান উদ্দেশ্য দেখায়– সেসব কৌশলের উন্নয়ন ঘটানো যার মাধ্যমে দরিদ্রদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসা যায়। সেই সাথে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, জেন্ডার সমতা, সামাজিক ন্যায়বিচার সমতার সাথে আর্থিক সমৃদ্ধি এবং পরিবেশ রক্ষা ইত্যাদি প্রশিকার কাজের মনোযোগের কেন্দ্র।

প্রতিষ্ঠার প্রথম ৫ বছরে প্রশিকা দরিদ্রদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলার লক্ষ্যে গ্রামীণ ভূমিহীনদের মধ্যে তাদের কাজের বিস্তার করেছিল। এই ভূমিহীনদের বিভিন্ন সমিতিতে সংগঠিত করা– আয় বৃদ্ধি কর্মসূচির সাথে সংযুক্তির পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধির ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হতো তখন। ফলে ওইসব অঞ্চলে ভূমিহীনরা গ্রামীণ অবিচারের বিরোধিতা, মজুরি বৃদ্ধির প্রতিবাদও করতো। প্রশিকার কর্মপদ্ধতিতে এবং সাংগঠনিক কাঠামোয় এ ধরনের কর্মতৎপরতা বেশিদিন ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। আর্থিক অনুদান প্রদানকারী সংস্থা এবং পুঁজিবাদী দেশসমূহ এতে সমর্থন দেয়নি। ফলে এর কাজকে নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে রাখতে হয়েছে যার মধ্যে দারিদ্র্যবিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণ, শিক্ষা, আয়বৃদ্ধিকারী কার্যক্রম, শহরে দরিদ্র উন্নয়ন, নারী উন্নয়ন, পরিবেশ, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ইস্যুতেই তাদের কাজে কেন্দ্রীভূত।

প্রথম ৫ বছর অতিক্রম করার পরই প্রশিকা ২ ভাগে বিভক্ত হয়।

- কুমিল্লা প্রশিকা উন্নয়ন কেন্দ্র
- ঢাকা ভিত্তিক প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা দুটোকেই আর্থিক সহযোগিতা করে। আশির দশকের শেষদিক থেকে ঢাকা প্রশিকার অগ্রসরতা লক্ষ্য করা যায়। ফলশ্রুতিতে প্রশিকা দেশের অন্যতম এনজিওতে রূপ লাভ করে। প্রাথমিকভাবে একে কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এইড সিডা অর্থ সাহায্য করলেও পরবর্তীতে নোভিব এবং ডিএফআইডি অর্থায়ন করে। এরাই প্রশিকা ডোনার কনসোর্টিয়ামের সদস্য। বর্তমান সরকারের আমলে এই সংগঠনটির বিরুদ্ধে সরকারবিরোধী রাজনৈতিক প্রচারণা সংগঠিত করা এবং আর্থিক অস্বচ্ছতার অভিযোগ এনে সরকারি এবং বৈদেশিক অনুদান বন্ধ রাখা হয়েছে। প্রশিকা এই অভিযোগ অস্বীকার করে আইনি প্রক্রিয়ায় লড়াই করছে। বর্তমানে অভ্যন্তরীণ আয় খাত থেকেই তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০০৪ সালের একনজরে প্রশিকার তথ্য অনুযায়ী প্রশিকার বাৎসরিক বাজট ছিল ৬৩০.১০ কোটি টাকা।

প্রশিকার একনজরের প্রতিবেদন ২০০৪-এ অনুযায়ী নিয়মিত কর্মচারী ৭ হাজার ১শ' ৪৩ জন। তার মধ্যে নারী ২৪০১ জন, বাকি পুরুষ।

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র নিজেদেরকে একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে দাবি করে। উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে প্রশিকা ১৮৬০ সালের সোশ্যাল রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট-২১-এর অধীনে ১৯৭৬-এ এবং গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের এনজিও ব্যুরোর অধীন ১৯৮৩ সালে রেজিস্ট্রেশন করে।

Dhaka University Institutional Repository

বাজেট ও অন্যান্য

	ব্র্যাক	প্রশিকা	নাগরিক উদ্যোগ
বাজেট		৬৩০.১০ কোটি	৬৬,১৮,৫৬৬ লাখ
নিজস্ব খাত	৭৭%	১০০%	০%
অনুদানের পরিমাণ	২৩%	০%	১০০%
লোন বিতরণ	২৫.৯০২ মিলিয়ন ৪৪২.৭৬ মিলিয়ন	২৭৬৬.৬০ কোটি	--
ফেরতের পরিমাণ	৯৮%	৯৫%	--

সূত্র : ব্র্যাক-২০০৪, প্রশিকা-২০০৪, নাগরিক উদ্যোগ-২০০৪

প্রশিকার কাজের উদ্দেশ্য হিসেবে প্রাধান্য দেয় ৫টি অঞ্চলকে :

- কাঠামোগত দারিদ্র্য দূরীকরণ
- পরিবেশ রক্ষা
- নারীর অবস্থার উন্নয়ন
- জনপ্রতিষ্ঠানগুলোতে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা
- গণতান্ত্রিক এবং মানবিক অধিকার অর্জন এবং ব্যবহারে জনগণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রশিকা তার যে কর্মসূচিগুলো হাতে নিয়েছে সেগুলো মোটা দাগে নিম্নরূপ–

- জনগণের সংগঠন গঠন
- মানবিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
- কার্যকরী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
- জনগণের সাংস্কৃতিক কর্মসূচি
- বৈশ্বিক শিক্ষা কর্মসূচি
- স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং কাঠামো গঠন কর্মসূচি
- শহরের দরিদ্র উন্নয়ন কর্মসূচি
- নারী উন্নয়ন কর্মসূচি
- উন্নয়ন নীতি পর্যালোনা ও অ্যাডভোকেসির জন্য ইনস্টিটিউশন
- উন্নয়ন সহায়ক কর্মসূচি (ডিএসসিআই)
- কর্মসংস্থান এবং আয় বৃদ্ধিকারী কর্মসূচি। এই কর্মসূচির আওতায় রয়েছে–
  - পরিবেশবান্ধব কর্মসূচি
  - বসতভিটায় বাগানের কর্মসূচি
  - বীজ উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ
  - গবাদি পশু উন্নয়ন কর্মসূচি
  - মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি
  - সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি
  - পানি সেচ কর্মসূচি
  - রেশম গুটির চাষ উন্নয়ন উৎস
  - ছোট অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন

Dhaka University Institutional Repository

- মধুচাষ কর্মসূচি
- গৃহ কর্মসূচি
- ক্ষুদ্র ব্যবসা
- দুর্যোগ মোকাবেলা কর্মসূচি।

ব্র্যাকের গ্রামীণ সংগঠনের মতো প্রশিকার অন্যতম কর্মসূচি হচ্ছে 'জনগণের সংগঠন' গঠন কর্মসূচি। এই কর্মসূচি বিশেষ করে গ্রামীণ এবং শহরে দরিদ্রদের জন্য করা হয়। ভূমিহীন প্রান্তিক এবং ছোট কৃষক, মৌসুমি পেশার জনগণ যেমন জেলে, কারিগর, ঋণ কারিগর এবং এসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যেকার নারীদের উৎসাহিত করা হয় নিজেদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে দল গঠন করার জন্য। এই প্রাথমিক দল সমিতি নামে পরিচিত। প্রাথমিক দলের প্রতিনিধিরা মিলে গ্রামে, ইউনিয়নে এবং উপজেলায় গ্রুপ ফেডারেশন গঠন করে। এই ফেডারেশন সকল প্রশাসনিক পর্যায়ে দরিদ্রদের স্বার্থের পক্ষ দাঁড়াবার অঙ্গীকার করে। একই সাথে দরিদ্রদের ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানা আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করে।

২০০৪ সালের একনজরে প্রশিকার তথ্য অনুযায়ী সারা দেশের ৫৭টি জেলায় মোট ১,৪৫,৭৩৬টি দল আছে তার মধ্যে নারী গ্রুপ ৯৪,৩১৭টি এবং পুরুষ গ্রুপ ৫১,৪১৯টি।

নাগরিক উদ্যোগ

১৯৯৫ সালে নাগরিক উদ্যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। মানবাধিকার এবং বিশেষভাবে স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠাকে শক্তিশালী করাই এর কাজের প্রাথমিক লক্ষ্য হিসেবে ছিল। পরবর্তীতে কর্মতৎপরতায় গ্রাম-সমাজে নারী-পুরুষের সমতা আনয়নের জন্য গ্রামীণ সালিশ ব্যবস্থাকে আরো গণতন্ত্রায়ন করাই এর লক্ষ্য হিসেবে নাগরিক উদ্যোগ দাবি করে। ২০০৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, তৃণমূল পর্যায়ে নারীদেরকে অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য নাগরিক উদ্যোগ 'মানবাধিকার এবং নারীর অধিকার' বিষয়ে নানা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়। একই সাথে পরিবারের কলহ দূর করতে মামলা-মোকাদ্দমার আগে সালিশী প্রক্রিয়াকে মজবুত করার বিষয়ে জোর দেয়।

বাংলাদেশে সবচেয়ে ক্ষমতাহীন ও দুঃস্থ অবস্থায় আছে গ্রামীণ নারীরা। এই নারীদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে আইনি অধিকার বিষয়ে সচেতন করে তোলার কাজ নাগরিক উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে 'সুশাসন ও মানবাধিকার' প্রতিষ্ঠা কাজের লক্ষ্য ও মনোযোগের কেন্দ্রে থাকলেও পরবর্তীতে নারী প্রশ্নে নাগরিক উদ্যোগ তার কাজের বিস্তৃতি ঘটায়।

নাগরিক উদ্যোগের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৪-এ অনুযায়ী নিয়মিত কর্মচারী ৫৫ জন। তার মধ্যে নারী ২৪ জন, পুরুষ ৩১ জন।

নাগরিক উদ্যোগের সকল কর্মসূচি অনুদান নির্ভর। এর ডোনার সংস্থা হিসেবে রয়েছে ইইডি, ব্রেড ফর দ্য ওয়ার্ল্ড, ক্রিশ্চিয়ান এইড, গ্লোবাল ফান্ড হিউম্যান রাইটস।

নাগরিক উদ্যোগ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ অ্যাক্ট নং-সি ৩৬০(১৭) কর্তৃক ১৯৯৫ সালে এবং এনজিও ব্যুরো নং-১২৪০-এ ১৯৯৮ সালে রেজিস্ট্রেশনকৃত একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। বর্তমানে নাগরিক উদ্যোগ তার কাজ ৪টি জেলায় বিস্তৃত করেছে। এই সংস্থা তার বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য নিজস্ব তৎপরতা ছাড়া সহযোগী সংস্থার মাধ্যমেও কাজ বাস্তবায়ন করে। বর্তমান যে ৪টি জেলায় এর কাজ আছে তা হলো :

- টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন
- রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন
- বরিশাল জেলার বানারীপাড়া উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন ও
- পিরোজপুর জেলার স্বরূপকাঠি উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন।

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

নাগরিক উদ্যোগ তার বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৩-২০০৪-এ নিম্নোক্ত লক্ষ্যসমূহকে সুনির্দিষ্ট করেছে :

- নারী-পুরুষ এবং সামাজিক শ্রেণী নির্বিশেষে সালিশ ও আইনগত সহায়তার মাধ্যমে দেশে সাম্য, গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ধারা শক্তিশালী করা।
- দেশে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও জবাবদিহিমূলক নির্বাচনী প্রক্রিয়া গড়ে তুলতে, তাতে জনঅংশগ্রহণ বাড়ানো এবং সে লক্ষে তৎপরতা চালানো।
- মানবাধিকার ও নারীর অধিকার সংক্রান্ত ধারণাকে জনপ্রিয় করা ও তা চর্চার বিষয় করে তোলার জন্য তৃণমূল পর্যায়ে শিক্ষামূলক কার্যক্রম চালানো।
- গণতন্ত্রকে বিকশিত করা এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের চর্চা নির্বিঘ্ন করতে যথোপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষে কাজ করা।
- তৃণমূল পর্যায়ে নারীর সংগ্রামকে সমর্থন, সহযোগিতা ও বিকশিত করা। জাতীয় নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় তার কার্যকর অংশগ্রহণ বাড়ানো।
- এনজিওকর্মী ও বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার সমাজকর্মীদের জন্য মানবাধিকার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।
- মানবাধিকার বিষয়ে কাজ করছে এমন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর জন্য নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।
- অর্থনীতি, মানবাধিকার, নারীর অধিকারসহ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে গবেষণা পরিচালনা।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে তিনটি এনজিওর কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, কার্যক্রমের আওতা, সদস্য সংখ্যা, নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ, সংস্থার বাজেট, নারী বিষয়ে কর্মসূচি এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা যায়। যার মাধ্যমে এসব সংস্থার কাজের প্রেক্ষাপট মতাদর্শিক অবস্থান সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায় যা গবেষণার জন্য সহায়ক।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

গবেষণার জন্য এনজিওসমূহের নির্দিষ্ট কার্যক্রমের পরিচিতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার জন্য এনজিওসমূহের নির্দিষ্ট কার্যক্রমের পরিচিতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এনজিও কর্মকাণ্ডে নারীর অবস্থান পরিবর্তনে কী ভূমিকা রেখেছে তা দেখা গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য। বেসরকারি সংস্থা পুঁজিবাদী উন্নত রাষ্ট্রের অনুদান ও সাহায্যপুষ্ট সংস্থাসমূহের মতাদর্শিকভাবে নারী-পুরুষ সমতা আনয়নের লক্ষ্যে যে দিকগুলোর ওপর গুরুত্ব দিয়ে কর্মসূচির বিন্যাস নির্দিষ্ট করেছে তার ব্যবহারিক দিক গবেষণার জন্য জরুরি বিষয়। এ কারণে তিনটি এনজিওর ঐসব কর্মসূচি গবেষণার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে, যার সাথে নারীদের সম্পৃক্ততা বেশি।

ব্র্যাক, প্রশিকা, নাগরিক উদ্যোগ– এই তিনটি বেসরকারি সংস্থার যেসব কর্মসূচির ওপর মাঠপর্যায়ে গবেষণা করা হয়েছে সেগুলোর পরিচিতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিচে আলোচনা করা হলো।

ব্র্যাকের অতিদরিদ্র অনুদান, ক্ষুদ্র ঋণ ও শিক্ষা কার্যক্রমের পরিচিতি

404193

ব্র্যাকের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাধীন ২টি কার্যক্রমে রয়েছে– ক্ষুদ্র ঋণ ও অতি দরিদ্র কর্মসূচি। এ দু'টির স্থানীয় কার্যালয় এবং ব্র্যাক কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রশাসনে নারী-পুরুষ সম্পর্কের অবস্থা কী এর পাশাপাশি কার্যক্রমগুলোতে ব্র্যাকের আদর্শিক অবস্থান মাঠপর্যায়ে কী মাত্রায় বাস্তবায়িত হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। একই সাথে এ সংস্থায় শিক্ষা কার্যক্রমে নারীর অবস্থান পর্যবেক্ষণ করা হয়। নিচে ব্র্যাকের ৩টি কার্যক্রম সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো।

অতিদরিদ্র কর্মসূচি

ব্র্যাকের অতি দরিদ্র কর্মসূচি সম্পর্কে জানবার আগে দারিদ্র্যের শ্রেণী বিভাগ যে মানদণ্ডে নির্ধারণ করা হয় তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সূচকের ভিত্তিতে দারিদ্র্যের শ্রেণী বিভাগ নির্ধারণ করে। তবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত সূচকটি হলো মাথাপিছু ক্যালোরি গ্রহণের পরিমাণ। এর ওপর ভিত্তি করেই দারিদ্র্যের সীমারেখা টানা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বিশ্বব্যাংকের (১৯৯৫-৯৬) মতে, দরিদ্র শ্রেণী বিভাগগুলো হলো : ১. দরিদ্র ও ২. চরম দরিদ্র।

দরিদ্র : যারা দিনে ২১২২ কিলো ক্যালোরি বা তার চেয়েও কম খাদ্য গ্রহণ করে।

চরম দরিদ্র : যারা দিনে ১৮০৫ কিলো ক্যালোরির কম খাদ্য গ্রহণ করে। এদের মধ্যে দুটি ভাগ আছে– ক. অতি দরিদ্র : যারা দিনে ১৮০৫ কিলো ক্যালোরির চেয়ে কম খাদ্য গ্রহণ করে। খ. নিঃস্ব : যারা দিনে ১৬০০ কিলো ক্যালোরি খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না। ভিক্ষুক, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ইত্যাদি এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোকে অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর 'উন্নয়নের জন্য' ব্র্যাক তার এই নতুন কর্মসূচির যাত্রা করে ২০০২ সালে। দারিদ্র্যবিমোচন, ক্ষমতায়ন ও বিশেষভাবে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে পরিচালিত কর্মকাণ্ডের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ ব্র্যাকের প্রধান কর্মসূচি। তা সত্ত্বেও নতুন আঙ্গিকে নারীর ক্ষমতায়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ব্র্যাক অনুদান প্রধান কর্মসূচি 'অতি দরিদ্র কর্মসূচি'র যাত্রা করেছে উত্তরবঙ্গের ৩টি জেলা থেকে। এই ৩টি জেলা হলো– রংপুর, কুড়িগ্রাম ও নীলফামারী। ৩টি জেলার মোট ২১টি উপজেলায় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। পরবর্তীতে আরো কয়েকটি জেলায় কর্মসূচি সম্প্রসারিত হয়। গোপালগঞ্জ, পঞ্চগড়, মাদারীপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনাসহ আরো কয়েকটি অঞ্চলে এর কাজ বিস্তৃত হয়।

অতি দরিদ্র কর্মসূচিতে ঋণ দেয়া হয় না। এর বদলে আর্থিক অনুদান বা সরাসরি সম্পদ হস্তান্তর করা হয় কেবল মাত্র নারীদের মধ্যে। অর্থাৎ যে সম্পদ দেয়া হয় তা আর ফেরত নেয়া হয় না। ব্র্যাকের ভাষায়, এ কর্মসূচির মাধ্যমে 'অতি দরিদ্রদে'র সাধারণ দরিদ্র মানুষ হিসেবে স্বীকৃতির সুযোগ মেলে। এর লক্ষ্য থাকে, **অতিদরিদ্রদের 'এমন পর্যায়ে নিয়ে আসা যাতে তারা ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির আওতায়' আসতে পারে। এর মূল দিক হিসেবে ব্র্যাক 'অতিদরিদ্রদের আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলা' বোঝায়।** এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কর্মসূচির সুবিধাভোগী এবং কর্মসূচি সংগঠকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রয়োজনীয় সামাজিক বিষয়ে সচেতন করার জন্য ১০টি ইস্যুতে আলোচনা করা হয়। এই ইস্যুগুলো হলো– **বিবাহ রেজিস্ট্রেশন, তালাক, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, বিবাহ বিচ্ছেদ, গ্রামীণ বিচার ব্যবস্থা, পরিবার পরিকল্পনা, ভিটামিন 'এ'র ঘাটতি পূরণ, ডায়রিয়া-আমাশা-কৃমিসহ পানিবাহিত রোগ ও আর্সেনিক এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা প্রসঙ্গ।** এছাড়া পুরো কর্মসূচির সাথে এলাকার জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য রয়েছে– পালাগান ও যাত্রার আয়োজন।

অনুদান এবং আয় সৃষ্টিকারী অতিদরিদ্র কর্মসূচির আওতায় রয়েছে– গাভী পালন, ছাগল পালন, মুরগি পালন, কৃষি (সবজি চাষ), সামাজিক বনায়ন (নার্সারি, পেঁপে বাগান), মাছ চাষ, অকৃষি কর্মকাণ্ড (জুতা ফ্যাক্টরি, স্যানেটরি ন্যাপকিন ফ্যাক্টরি অন্যান্য)।

অতিদরিদ্র কর্মসূচির আওতাধীন হবেন যেসব নারীরা তাদের নিম্নোক্ত ৫টি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ন্যূনতম ২টি থাকতে হবে, এই নির্দেশনাই ব্র্যাক দেয়–

- যে অন্যের বাড়িতে কাজ করে বা ভিক্ষাবৃত্তির ওপর নির্ভরশীল।
- ১০ শতাংশ বা তার কম নিজস্ব জমি থাকা।
- যার পরিবারে কর্মক্ষম পুরুষ নেই।
- স্কুলপড়ুয়া বয়সের ছেলেমেয়েরা অর্থ উপার্জনের কাজে নিয়োজিত।
- পরিবারে কোন উৎপাদনশীল সম্পদ না থাকা।

অবশ্য পালনীয় শর্ত : উপরে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আরো দুটি শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে– ১. পরিবারে অন্তত একজন প্রাপ্তবয়স্ক কর্মক্ষম নারী সদস্য থাকতে হবে, যার আয়মূলক কাজে অংশগ্রহণের যোগ্যতা আছে। এমনকি সে শারীরিকভাবে পঙ্গু হলেও যতদিন তার এই কাজ করার ক্ষমতা থাকবে ততদিন সে কর্মসূচির আওতাধীন থাকবে এবং ২. পরিবারের কোনো সদস্য অপর কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বা ক্ষুদ্র ঋণপ্রদানকারী সংস্থার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারবে না।

গ্রাম সহায়ক কমিটি বা দারিদ্র্যবিমোচন কমিটি : প্রতিটি অতিদরিদ্র কর্মসূচির কর্মাঞ্চলে বা গ্রামে ১টি গ্রাম সহায়ক কমিটি গঠন করা হয় কাজের সুবিধার্থে। এ কমিটি পল্লীসমাজের ২ জন সদস্যসহ শিক্ষিত, সচ্ছলদের মধ্যে ৭ জন নিয়ে কমিটি গঠন করে। ব্র্যাক মনে করে, এর মাধ্যমে অতিদরিদ্রদের সাথে স্থানীয় গোষ্ঠীর সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটবে এবং ওই কমিটির সদস্যরা অতিদরিদ্রদের নানারকমভাবে সহায়তা করতে পারবে। সহায়ক কমিটির মাধ্যমে এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছ থেকে টিউবওয়েল, বাসগৃহ নির্মাণ সহায়তা, শৌচাগার নির্মাণে সহায়তা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক ঐক্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই কমিটি গঠন করা হয়।

গবেষণা অঞ্চল নীলফামারী সদরের তথ্য : অতিদরিদ্র কর্মসূচির প্রাথমিক ও মডেল কাজের অঞ্চল রংপুর, কুড়িগ্রাম ও নীলফামারী জেলার মধ্যে গবেষণার জন্য বেছে নেয়া হয় নীলফামারী জেলা। নীলফামারী জেলার সদর অঞ্চলের তুলনায় সৈয়দপুরই মূলত তৎপরতার কেন্দ্র। নীলফামারীর মোট ৬টি থানায় এই কর্মসূচি বিস্তৃত হয়েছে। থানাগুলো হলো– ১. নীলফামারী সদর, ২. সৈয়দপুর, ৩. কিশোরগঞ্জ, ৪. জলঢাকা, ৫. ডিমলা ও ৬. ডোমার।

Dhaka University Institutional Repository

কাজের সুবিধার জন্য নীলফামারী সদর অঞ্চল বেছে নেয়া হয়। নীলফামারী সদরে ২০০২ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত সময়ে মোট ৪০২ জনকে সম্পদ হস্তান্তর করা হয়েছে। নীলফামারী সদরে যেসব সম্পদ হস্তান্তর করা হয়েছে সেগুলো হলো–

২০০২-২০০৪ সম্পদ হস্তান্তরে

সাল	অনুদানপ্রাপ্ত	অনুদান
২০০২	২৯৫ জন	গাভী পালন ছাগল পালন নার্সারি ক্ষুদ্র ব্যবসা/ ননফার্ম
২০০৩	৭ "	
২০০৪	১০০ "	
সর্বমোট	**৪০২ "**	

(তথ্যসূত্র : ব্র্যাক, নীলফামারী সদর কার্যালয়)

নীলফামারী জেলা ও সদরের কার্যালয়ে প্রশাসনিক এবং কর্মসূচির কাজে যুক্ত কর্মকর্তা ও সংগঠকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে গবেষণা পরিচালনা করে প্রশাসনে নারী-পুরুষ সম্পর্ককে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া নীলফামারী জেলা সদরের আওতাধীন কবিরাজিপাড়া, ডাঙ্গাপাড়া, ফুলতলা, পূর্বইটখোলাসহ কয়েকটি অঞ্চলের ১. গাভী পালন ২. ছাগল পালন ৩. নার্সারি ৪. ক্ষুদ্র ঋণ ৫. জুতা কারখানায় কর্মরত– এই ৫ ধরনের টিইউপি সদস্যদের সাক্ষাৎকার সংগ্রহ, কেসস্টাডি লিপিবদ্ধ করে গবেষণায় অতিদরিদ্র কর্মসূচি নারী-পুরুষের সম্পর্কে সমতা আনয়নে কী ভূমিকা রেখেছে তা পর্যবেক্ষণ করা হয়।

ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

ব্র্যাকের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রাম সংগঠন, ক্ষুদ্র অর্থায়ন বা ক্ষুদ্র ঋণ, কর্মসংস্থান এবং আয় সৃষ্টিকারী প্রোগ্রাম, প্রোগ্রাম সহায়ক ব্যবসা ইত্যাদির মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বা ব্র্যাকের ব্যবহৃত ভাষা 'ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচি' কেন্দ্রীয় কর্মসূচি। বর্তমানে এর প্রধান কর্মসূচিতে পরিণত হয়েছে ক্ষুদ্র ঋণ। ১৯৭৪ সাল থেকেই এর যাত্রা শুরু হয়। সদস্যরা একে 'মাদার' প্রোগ্রাম বলে চিহ্নিত করেন। প্রতিষ্ঠাতা ফজলে হাসান আবেদ তার এক সেমিনার পেপারে এই কর্মসূচিকে অভিহিত করেন এভাবে– "ক্ষুদ্র অর্থায়ন যা একই সাথে ক্ষুদ্র ঋণ নামে পরিচিত তা বাংলাদেশে এবং বিশ্বের বড় অংশে একটি আন্দোলন হিসেবে বিকশিত হয়েছে। ক্ষুদ্র অর্থায়নের ধারণার জন্মভূমি হিসেবে বাংলাদেশ বিবেচিত হতে পারে।" *(আবেদ, ২০০২)*

ব্র্যাক তার কার্যক্রমে ক্ষুদ্র ঋণের সুবিধাগ্রহী সদস্য হিসেবে বেছে নিয়েছে গ্রামীণ দরিদ্র বিশেষভাবে দরিদ্র নারীদের। এর মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্রদের আয় বৃদ্ধি, ছোট ব্যবসা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আত্মনির্ভরশীল করে তোলাকে সংস্থা তার লক্ষ্য হিসেবে দাবি করে। বিশেষভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং ক্ষমতায়নের জন্য ক্ষুদ্র ঋণকে একটি বিরাট পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

মূলত গ্রামীণ দরিদ্র, বস্তিতে বসবাসকারী, ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষি, দরিদ্র, বঞ্চিত নারী ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতার তালিকায় পড়েন। বাংলাদেশের দরিদ্র ভূমিহীন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, যারা আর্থিক অবস্থার কারণে আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনায় যুক্ত হতে পারে না তারা এনজিওগুলোর টার্গেট গ্রুপ হিসেবে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত হয়। আর্থিক অবস্থার কারণে আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনায় জামানত প্রদান করার মতো অবস্থায় তারা থাকেন না। পাশাপাশি গ্রামীণ মহাজনি ব্যবস্থায় সুদের হারের পরিমাণ এনজিওর তুলনায় অত্যাধিক হবার কারণে দরিদ্ররাও টিকে থাকার সংগ্রামে যুক্ত হয় ক্ষুদ্র ঋণের চক্রে।

ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি যে লক্ষ্য নিয়ে পরিচালিত হয়, সংস্থার ভাষায় তা হলো– **বিশেষভাবে গ্রামীণ এলাকায় দরিদ্র নারীদের কাছে ঋণ সুবিধা সহজলভ্য করা; চলনসই দরে ঋণ সুবিধা প্রদান; ঋণ সরবরাহের মাধ্যমে দরিদ্র নারীদের আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে যুক্ত করা; গ্রামীণ দরিদ্রদের আয়ের হার বাড়িয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে অগ্রসর করা এবং ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজিতে টিকে থাকা।**

Dhaka University Institutional Repository

ব্র্যাকের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি মোটা দাগে ৩ ভাগে বিভক্ত– দাবি, উন্নতি ও প্রগতি।

দাবি : দাবির সদস্য তারাই যাদের ১ একরের কম জমি আছে। বস্তি বা ঘনবসতি পল্লীতে বসবাস করে। মূলত শারীরিক শ্রম বা মজুরির বদলে জীবন নির্বাহ করে এমন ব্যক্তিরা দাবির লোন পেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সুদের পরিমাণ শতকরা ১৫ ভাগ। ১ বছরের মধ্যে ৪৬ সপ্তাহের কিস্তির মাধ্যমে লোন পরিশোধযোগ্য।

ঋণের পরিমাণ	
২০০৩	২০০৪
৪-১৫ হাজার টাকা	৪-৩০ হাজার টাকা
৫০-২২০ ইউএস ডলার	৫০-৫০০ ইউএস ডলার

উন্নতি : কৃষি অর্থনীতির উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রান্তিক নারীদের উন্নতির আওতায় ঋণ প্রদান করা হয়। 'উন্নতি'র সদস্য তারাই যাদের ১ একরের বেশি জমি আছে। যারা কোনো খামার বা ননফার্ম প্রতিষ্ঠানে যুক্ত। এই লোন ১২ থেকে ১৮ মাসের মধ্যে কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। সুদের পরিমাণ শতকরা ১৫ ভাগ।

ঋণের পরিমাণ	
২০০৩	২০০৪
১০-৩০ হাজার টাকা	৯-৫০ হাজার টাকা
১৭০-৫২০ ইউএস ডলার	১৬৬-৮৩৩ ইউএস ডলার

প্রগতি : প্রগতির কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৯৬ সালে। প্রগতির কার্যক্রম 'মেলা' নামে পরিচিত। বাংলাদেশের গ্রামীণ ও অর্ধশহরে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি করা এর লক্ষ্য। মেলা সেসব দরিদ্রদের ঋণ প্রদান করে, যারা দাবি বা উন্নতির আওতায় পড়ার অবস্থায় নেই। আবার যারা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় যাবার মতো অবস্থায়ও নেই। এই ধরনের ব্যক্তিদের ক্ষুদ্র ব্যবসার পুঁজি হিসেবে মেলা ঋণ প্রদান করে। ব্র্যাক সদস্য বা এর বাইরের যে কেউ এই ঋণ পেতে পারে। ১২ থেকে ১৮ মাসের কিস্তিতে এ পর্যায়ে ঋণ পরিশোধযোগ্য। সুদের হার শতকরা ১৫ ভাগ।

ঋণের পরিমাণ	
২০০৩	২০০৪
৩০ হাজার - ৩ লাখ টাকা	২০ হাজার - ৩ লাখ টাকা
৩৫০-৫০০ ইউএস ডলার	৩৩৩-৫ হজার ইউএস ডলার

ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির মধ্যে **গবেষণাকর্মের জন্য 'দাবি'র কর্মসূচি পর্যবেক্ষণ করা হয়।** নিচে দাবি কার্যক্রম কিভাবে পরিচালিত হয় তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

ব্র্যাকে কাজের অঞ্চলগুলোতে গ্রামীণ সংগঠন গড়ে তোলা হয়। গ্রামীণ সংগঠনের সদস্যদের মধ্যেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। গ্রামীণ সংগঠনের সদস্যরা ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত হয়। ন্যূনতম ২০ জন এবং সর্বোচ্চ ৪০ জন সদস্য নিয়ে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি শুরু হয়। ৪০ জন নিয়ে গঠিত কার্যক্রম যে এলাকাতেই শুরু হবে সে এলাকার নামানুসারে সমিতির নাম হবে। যেমন– 'পাকুড়িয়া শ্রমজীবী মহিলা সমিতি'। সমিতির সদস্যদের ৫ জন করে ক্ষুদ্র দল গঠন করা হয়। দলে ১ জন সভাপতি, ১ জন কোষাধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করে। যে কোনো ঋণের ক্ষেত্রে নিজ ক্ষুদ্র দলের অনুমতি গ্রহণ এবং সমিতির সভায়

Dhaka University Institutional Repository

ঋণের জন্য রেজুলেশন করতে হয়। রেজুলেশনের পর ঋণ অনুমোদনের জন্য এলাকা বা শাখা অফিসে প্রেরণ করা হয়। ঋণ দেয়া বা না দেয়া অফিসের ওপর নির্ভরশীল।

ঋণ গ্রহণকারীদের সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হবে। প্রতি সপ্তাহে ন্যূনতম ৫ টাকা জমা দিতে হবে। প্রত্যেক সপ্তাহে ব্র্যাক কর্মসূচি সংগঠকরা গ্রামের নির্দিষ্ট একটি বাড়িতে সকাল ৮টার মধ্যে উপস্থিত হয়। সেখানে সকল নারী সদস্য জমায়েত হয়। প্রথমেই শৃঙ্খলা তৈরির জন্য ঘণ্টা বাজানো হয়। এরপর ওই সদস্যদের মধ্য থেকে যে কোনো ১ জন সকল সদস্যকে মোট ১৮টি প্রতিজ্ঞা পাঠ করান।

সমাজসচেতনতামূলক এই ১৮টি প্রতিজ্ঞা হলো :

- দুর্নীতি ও অন্যায়ের পক্ষে কোন কাজ করিব না।
- পরিশ্রম করিব ও সংসারের উন্নতি করিব।
- ছেলে-মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠাইব।
- পরিবার ছোট রাখিব ও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করিব।
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিব ও ঘরবাড়ি পরিচ্ছন্ন রাখিব।
- সব সময় বিশুদ্ধ পানি পান করিব।
- খাবার ঢাকিয়া রাখিব, হাতমুখ না ধুইয়া খাইতে বসিব না।
- যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করিব না। পায়খানা তৈয়ার করিব।
- বাড়ির আনাচে-কানাচে শাক-সবজির চাষ এবং গাছ লাগাইব।
- সকল অবস্থায়ই অন্যকে সাহায্য করিব।
- বহু বিবাহ ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়িব।
- সংগঠনের প্রতি অনুগত থাকিব এবং নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিব।
- কোন কিছু ভালভাবে না বুঝিয়া দস্তখত করিব না।
- সাপ্তাহিক ও মাসিক সভায় সময়মত এবং নিয়মিত উপস্থিত হইব।
- সংগঠনের সভার সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিব।
- সাপ্তাহিক নিরাপত্তা সঞ্চয় নিয়মিত জমা দিব।
- ঋণ গ্রহণ করিলে সময়মত পরিশোধ করিব।
- মেয়ে ও ছেলেকে সমানভাবে মানুষ করিব।

(সূত্র : ঋণ পাশবই, ব্র্যাক, ৭৫ মহাখালী, ঢাকা-১২১২)

গবেষণা অঞ্চলে প্রাপ্ত তথ্য : ব্র্যাকের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির 'দাবি'র আওতাধীন সদস্যদের মধ্যে জরিপ, সাক্ষাৎকার ও কেসস্টাডির মধ্য দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। নোয়াখালী সদর থানার অশ্বদিয়া ইউনিয়নের অলীপুর এবং রাজশাহী জেলার পবা থানার বিভিন্ন অঞ্চলে মাঠপর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

রাজশাহী শহর থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত পবা থানা কার্যালয়ের অধীন তকিপুর, পাকুরিয়া, কুমড়াপুকুড়, বড়পুকুর, বারুইপাড়া, বালিয়াডাঙ্গা মোট ৫টি অঞ্চলের সদস্যদের মধ্য থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। অন্যদিকে নোয়াখালী জেলা সদরের মোট ২০টি কর্মঅঞ্চলের মধ্যে অশ্বদিয়া ইউনিয়নের অধীন অলীপুর গ্রামে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। অলীপুরে মোট ৩টি সমিতিতে ৬৫ জনের মতো সদস্য রয়েছে। গতবছর আনুমানিক সাড়ে ৩ লাখ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষা কার্যক্রম

অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ১৯৮৫ সালে যাত্রা শুরু করে। এই কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে ব্র্যাক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি কাজের বিস্তৃতির সাথে শিক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত হয় আরো কয়েকটি কর্মসূচি। যার মধ্যে রয়েছে কিশোর-কিশোরীদের জন্য সমাজ সচেতনতামূলক বিষয়ক শিক্ষা হিসেবে রয়েছে উন্নয়ন ও আপন কর্মসূচি। এছাড়া বয়স্ক শিশুদের মৌলিক শিক্ষা, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী শিশুদের শিক্ষা, শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম, প্রাক-প্রাথমিক কার্যক্রম, কমিউনিটি স্কুল, প্রাথমিক পরবর্তী শিক্ষা কার্যক্রম ইত্যাদি শিক্ষা উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতাধীন।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিস্তৃতি। শিক্ষা কার্যক্রম দরিদ্র, গ্রামীণ ছাত্র, বিশেষভাবে মেয়ে শিশু, যারা স্কুলে যাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত অথবা স্কুল থেকে ঝরে পড়েছে এদেরকে তাদের এই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য বাছাই করে। বর্তমানে ৪৯ হাজারের বেশি প্রাথমিক এবং প্রাথমিক পরবর্তী স্কুল রয়েছে। এসব স্কুলে প্রায় ২.৮ মিলিয়ন ২ লাখের ওপরে ছাত্র পড়াশোনা করে।

গবেষণার জন্য শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে বেছে নেয়া হয় অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষাকে। এই কার্যক্রমে ৮ থেকে ১০ বছরের শিশুদের ছাত্র হিসেবে বাছাই করা হয় (বার্ষিক প্রতিবেদন-২০০৪)। '১ম ও ২য় শ্রেণী ৮ মাস ক্লাস হয়। ৩য় শ্রেণী ৯ মাস এবং ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণী ১০ মাস করে মোট ৪ বছরের মধ্যে এই কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়' বলে সাক্ষাৎকারে ম্যানেজার ইনচার্জ শাহানাজ পারভীন জানায়।

বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী শতকরা ৯৮% স্কুল শিক্ষক স্থানীয় পর্যায় থেকে বাছাই করা হয় এবং শিক্ষক হিসেবে বেছে নেয়া হয় বিবাহিত নারীদেরকে। শিক্ষকদের মধ্যে ৭৩% এইচএসসি পাস। এছাড়া বাকি শিক্ষক এসএসসি পাস। প্রথম শ্রেণী থেকে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষকরা ৮২৫ থেকে ৮৫০ টাকা সাড়ে ৪ ঘণ্টা ক্লাস করিয়ে বেতন পায়। ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর শিক্ষকরা গণিত ভাতা বা সম্মানি হিসেবে ১শ' টাকার বেশি পান।

গবেষণা অঞ্চলের তথ্য : কাজের অঞ্চল হিসেবে বেছে নেয়া হয় ঢাকা জেলার স্কুল। ঢাকা জেলায় মোট কাজের অঞ্চল হিসেবে রয়েছে ১৩টি অঞ্চল। এগুলো হলো– ১. মিরপুর, ২. যাত্রাবাড়ি, ৩. টঙ্গী, ৪. সাভার, ৫. উত্তরা, ৬. মগবাজার, ৭. শ্যামলী, ৮. বাড্ডা, ৯. কাঁচপুর, ১০. জিঞ্জিরা, ১১. রহিতপুর, ১২. নারায়ণগঞ্জ ও ১৩. কামরাঙ্গীরচর।

এই অঞ্চলগুলোতে মোট স্কুল রয়েছে ৮৮৭টি। এই ১৩টি অঞ্চলের মধ্যে কাজের জন্য নির্দিষ্ট করা হয় কামরাঙ্গীরচর থানা। ঢাকার শাহবাগ থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে এটি অবস্থিত। কামরাঙ্গীরচরের মধ্যে কাজের অঞ্চল মোট ৫টি– ১. ধানমন্ডি ২. লালবাগ ৩. হাজারীবাগ ৪. মোহাম্মদপুর ও ৫. কামরাঙ্গীরচর।

এই ৫টি অঞ্চলে স্কুল রয়েছে মোট ৯০টি। যার মধ্যে ৭৭টি হলো কামরাঙ্গীরচরে অবস্থিত। অন্যান্য কাজের অঞ্চলে স্কুল এবং ছাত্র সংখ্যা কম। কোনো কোনো অঞ্চলে স্কুল বন্ধও হয়ে পড়েছে। এর কারণ হিসেবে কামরাঙ্গীরচরের ইনচার্জ শাহনাজ বলেন, শহরে আবাসিক এলাকায় শিশুরা নানারকম ভাসমান পেশায় যুক্ত। তারা বস্তিতে অস্থায়ীভাবে বসবাস করে। সরকারি এলাকায় গড়ে ওঠা বস্তি উচ্ছেদ হলে শিশুরা স্থান পরিবর্তন করে। ফলে এসব অঞ্চলে কাজ গড়ে তোলা কঠিন। তবে কামরাঙ্গীরচরের মতো ঘনবসতি অঞ্চলে যেখানে ছোট-বড় বিভিন্ন কারখানা রয়েছে, যেখানে নানা পেশার শ্রমজীবীরা দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে সেখানে স্কুলের স্থায়িত্ব বেশি। কামরাঙ্গীরচর এলাকায় মোট ৭৭টি স্কুলে ছাত্রসংখ্যা ২৩৫১। যার মধ্যে নারী ছাত্র ১৬৪৬, পুরুষ ছাত্র ৭০৫। বছরে ঝরে পড়ার হার ৩১%। মোট নারী শিক্ষক ৭৭ জন। ৭৭ জনের মধ্যে ৫৯ জনের শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি পর্যন্ত। বাকি ১৮ জন এইচএসসি। শিক্ষকদের মধ্যে ৪৫ জন বিবাহিত, অবিবাহিত ৩২। বছরে শিক্ষকদের ঝরে পড়ার হার ১৭%। *(ব্র্যাক, কামরাঙ্গীরচর)*

প্রশিকার ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি

প্রশিকার ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিতে নারী-পুরুষ উভয় সদস্য থাকলেও নারী সদস্যরাই এখানে বেশি। এই কর্মসূচির আওতায় দুই ধরনের লোন দেয়া হয়। একটি সাধারণ অন্যটি বাণিজ্যক। সাধারণ ঋণ দরিদ্রদের মধ্যে প্রদান করা হয়।

সাধারণ ঋণগ্রহীতাদের ঋণপ্রাপ্তি নিয়মিত করার জন্য নিম্নোক্ত শর্ত পূরণ করতে হয়–

- দল গঠন
- দলের বৈঠকে নিয়মিত উপস্থিতি
- লেনদেন ঠিক রাখা
- অন্য কোনো সংস্থার সাথে যুক্ত না থাকা।

ঋণগ্রহীতাদের ১৪% সুদে ৪৬ সপ্তাহে পরিশোধযোগ্য উপায়ে ঋণ প্রদান করা হয়। ন্যূনতম ২০ জন হলে

Dhaka University Institutional Repository

একটি দল গঠন করা যায়। বিভিন্ন নামে দলের নামকরণ করা হয়। যেমন 'সূর্য শিখা' দল। প্রত্যেক দলের আলাদা কোড ও প্রত্যেক সদস্যের অলাদা নামে একাউন্ট খোলা হয়। দলে ৫ জনের একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়, যেখানে যথাক্রমে সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, সাধারণ সম্পাদক ও সহ-সাধারণ সম্পাদক পদ রয়েছে।

ঋণগ্রহীতাদের নিম্নোক্ত বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয় :

- দরিদ্রায়ন প্রক্রিয়া ও দারিদ্র্যবিমোচন
- সাংগঠনিক
- নারীর ক্ষমতায়ন
- পরিবেশ ও উন্নয়ন শিশুদের
- স্বাস্থ্য ও শিশু এবং
- গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার।

গবেষণা অঞ্চলের তথ্য : গবেষণার জন্য ধানমন্ডি ও মোহাম্মদপুর থানার কাজ পর্যবেক্ষণ করা হয়। এই অঞ্চলের আওতায় শহরের দরিদ্র নারী-বস্তি এলাকায় বসবাসকারী, অল্প আয়ের নারী-পুরুষদের ঋণ প্রদান করা হয়। মোট ২০ জন মাঠকর্মী যাদের প্রশিকার ভাষায় বলা হয়, উন্নয়ন কর্মী, তারাই ঋণ ব্যবস্থাপনার সকল কাজ করে থাকেন।

নাগরিক উদ্যোগ

মানবাধিকার, আইনি অধিকার ও নারীর অধিকার– এ ৩টি দিককে গুরুত্বে রেখে নাগরিক উদ্যোগ তার যে কর্মসূচিগুলো নির্দিষ্ট করেছে সেগুলো হলো : শালিস ও নারীর অধিকারের উন্নতি বিধান। এর আওতাধীন– শালিস কমিটি, আইন ও শালিস কর্মশালা এবং মনিটরিং সভা; নারীর নেতৃত্ব উন্নয়ন ও নারীর মানবাধিকার শিক্ষা। এর আওতাধীন– প্রশিক্ষণ, নারী দল আলোচনা ও নারী নেত্রী সম্মেলন; প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা; নেটওয়ার্ক ও গবেষণা।

গবেষণার জন্য যে **কর্মসূচিগুলোর** ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে তা সম্পর্কে নাগরিক উদ্যোগের নিজস্ব কর্মসূচির পর্যালোচনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

সালিশ ও নারীর অধিকার উন্নতি বিধান

দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও নারীর জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে এই সংস্থা। আর দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং নারীর হাতের নাগালে আইনি অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মাধ্যম হিসেবে প্রচলিত সালিশ ব্যবস্থার ওপর গুরুত্বারোপ করে এই সংগঠনটি। **ফলে প্রচলিত সালিশ ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক, গতিশীল করা, একই সাথে শিক্ষা সচেতনতার মাধ্যমে তৃণমূল নারীদের ক্ষমতায়নে সহযোগিতা করা এর অন্যতম লক্ষ্য।**

সালিশ কর্মসূচির কাজগুলো হলো–

- সালিশ কর্মসূচির অন্যতম কাজ ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে গ্রাম সমাজের গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিবর্গদের নিয়ে কমিটি গঠন করা। এই কমিটির সদস্যদের নাগরিক উদ্যোগ প্রশিক্ষণ দিয়ে আইনি অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলার উদ্যোগ নেয়। এই কমিটি ইউনিয়ন পর্যায়ের সালিশে অংশগ্রহণ করে, যাতে সালিশ গণতান্ত্রিক এবং আইনের কাঠামোর মধ্যে থাকে তার ব্যবস্থা নেয়।
- এছাড়া ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদকে এ কাজের সহায়ক অবস্থায় রাখার জন্য পুরো ইউনিয়ন পরিষদের সাথে এই সংগঠন আইনি অধিকার বিষয়ে বৈঠক করে তাদেরকে সচেতন করার বিষয়ে মনোযোগ দেয়।
- প্রতি ৩ মাস পরপর সালিশ কমিটি বিভিন্ন কেস নিয়ে ফলোআপ বৈঠক করে ।

Dhaka University Institutional Repository

নারীর নেতৃত্ব উন্নয়ন ও নারীর মানবাধিকার শিক্ষা

প্রশিক্ষণ : তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের অধিকার রক্ষায় সামাজিক আন্দোলনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে 'নারীর নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ' কর্মসূচি চালু করেছে এ সংগঠন। এ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রত্যেক ওয়ার্ডে ১ জন করে নারী নেত্রী প্রশিক্ষণ আওতায় আনা হয়। নাগরিক উদ্যোগ কর্মশালায় প্রতি ইউনিয়নে স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচিত নারী সদস্য ৩ জন, প্রতিটি ওয়ার্ড হতে ১ জন এবং কলেজ পর্যায়ের ২ জনসহ মোট ১৪ জন নারী ২ ইউনিয়ন হতে মোট ২৮ জনকে নিয়ে নারী নেত্রী প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে।

বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ৮টি ইউনিয়নে গতবছর ৪টি ব্যাচ 'নারীর নেতৃত্ব উন্নয়ন ও নারীর মানবাধিকার' বিষয়ক প্রশিক্ষণের কাজ সম্পন্ন করেছে। এতে মোট ১০০ জন নারী অংশগ্রহণ করেছে।

নারী দল : নারী দলের আলোচনার মাধ্যমে নারীদের তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার কাজ করা হয় এবং এলাকার নানা তৎপরতা যেমন উপজেলা নির্বাচনসহ এলাকার নানা তৎপরতায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা হয়। এছাড়া যেসব বিষয় আলোচিত হয় তা হলো :

- নারীর ওপর বৈষম্যের কারণ
- নারীর পুনঃউৎপাদনের অধিকার
- সিডো
- পারিবারিক আইন
- নির্যাতনবিরোধী আইন

নারী নেত্রী সম্মেলন : নারীর অধিকার রক্ষায় সামাজিক আন্দোলনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে নারী নেত্রী প্রশিক্ষণ শেষ হবার পর নারী নেত্রী সম্মেলন কর্মসূচিতে মনোযোগ দেয়া হয়।

এই কর্মসূচিতে প্রশিক্ষিত নারী নেত্রীদের নিয়ে একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করছে। যে নেটওয়ার্ক দেশের বিভিন্ন প্রান্তের তৃণমূল নারী নেত্রীদের যোগাযোগের বন্ধন হিসেবে কাজ করবে। এই নেটওয়ার্কের আওতায় প্রতিবছর নারী দিবস পালিত হয়। 'তৃণমূল নারী নেতৃত্ব ও সম্মেলন' সমাবেশ শেষ হয় যৌথ ঘোষণাপাঠ ও নির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে। কর্মসূচিগুলো হলো– **নারী নির্যাতন বন্ধ করা, বাল্যবিবাহ রোধ, নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ, জন্মনিয়ন্ত্রণ চালু, নারীর শিক্ষা-স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা, নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, ইউনিয়ন পরিষদে নারীর ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।**

গবেষণা অঞ্চলের তথ্য : গবেষণার জন্য টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি অঞ্চল নির্দিষ্ট করা হয়। কালিহাতিতে মোট ৬টি ইউনিয়নে এদের কাজ বিস্তৃত আছে। এর মধ্যে আগচারাণ গ্রামে নাগরিক উদ্যোগের সালিশ ও নারী দলের আলোচনায় উপস্থিত থেকে তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। বেহালাবাড়ি সমজানি অঞ্চলে সালিশের সুবিধাপ্রাপ্তদের কাছ থেকে তথ্য ও কেসস্টাডি সংগ্রহ করা হয়।

ব্র্যাক ও প্রশিকার জেন্ডারবিষয়ক নীতিমালা ও কর্মসূচি

ব্র্যাক, প্রশিকা, নাগরিক উদ্যোগ– তিনটি সংস্থাই সংগঠনের অভ্যন্তরে নারী-পুরুষ সম্পর্ক উন্নত করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে। তারা বলে থাকে যে, সংগঠনের অভ্যন্তরে নারী-পুরুষ সম্পর্ক উন্নত করতে পারলে সংগঠনের কাজের পরিবেশ সমুন্নত হবে এবং কাজ শক্তিশালী হবে, কাজের সমন্বয় যথাযথ হবে।

বিদ্যমান সমাজ কাঠামোয় যে পরিবেশ থেকে নারী-পুরুষরা এনজিও কর্মী হিসেবে যোগ দেয় তারা প্রত্যেকেই সমাজের বিদ্যমান চিন্তাধারা থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু এই চিন্তাধারা কাজের পরিবেশকে ভারী করে তোলে, কাজের শক্তিকে দুর্বল করে দেয়। বর্তমান সময় 'উন্নয়ন' জগতের সাথে জড়িয়ে আছে নারী প্রশ্ন। তাই আধুনিক অগ্রসর হিসেবে দাবিদার এনজিওতে বর্তমান জেন্ডার, নারী, সমাজ সচেতনতা– এসব বিষয়ে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা উত্থাপিত হতে দেখা যায়। একই সাথে রয়েছে জেন্ডারবিষয়ক নীতিমালা, জেন্ডার উন্নয়নে নানা কর্মসূচি।

ব্র্যাক, প্রশিকা ও নাগরিক উদ্যোগ– তিনটি সংগঠনেই অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে 'নারী', 'নারী উন্নয়ন' ইত্যাদি বিষয় ব্যাপক আলোচিত বিষয়। প্রত্যেক এনজিও কর্মী-কর্মকর্তা জেন্ডার, ইমপাওয়ারমেন্ট, ডেভেলপমেন্ট– এসব

Dhaka University Institutional Repository

শব্দবন্ধের সাথে পরিচিতি। নির্দিষ্টভাবে ব্র্যাক ও প্রশিকার জেন্ডারবিষয়ক নীতিমালা রয়েছে। ব্র্যাকের যৌন নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা সাম্প্রতিক সময়ে তৈরি হয়েছে। এছাড়া ব্র্যাক জেন্ডার কোয়ালিটি অ্যাকশন লার্নিং (জিকিউএএল) প্রোগ্রাম চালু রয়েছে। নিচে ব্র্যাক ও প্রশিকার জেন্ডার পলিসি ও জিকিউএএল কর্মসূচি বিষয়ের উল্লেখ করা হলো।

ব্র্যাক

ব্র্যাকের প্রধান তিনটি কর্মসূচি : গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি, অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি এবং স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা– এ তিনটিতেই প্রধান মনোযোগের কেন্দ্র নারী ও শিশু। সে কারণে ব্র্যাক শুধু তার সুবিধাভোগীদেরই নয় তার কর্মীদের জন্য নানারকম নীতি প্রণয়ন করেছে।

জেন্ডার পলিসিতে নারীদের কাজ এবং নারী বিষয়ে যে দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের কথা কর্মসূচিতে উল্লেখ আছে তা আলোচনা করা হলো। ব্র্যাক মনে করে, 'নারীরাই সমাজ ও পরিবারের পরিবর্তনের হাতিয়ার' এটা দুনিয়াব্যাপী স্বীকৃত যে, কোনো পরিবার ভালো থাকার জন্য গার্হস্থ্য অর্থনীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যার অংশ হচ্ছে খাদ্যের নিশ্চয়তা, সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং শিশু পালন। আর এ কাজে নারীদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। *(জেন্ডার পলিসি, ২০০২)*

এ উপলব্ধি থেকে নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্র্যাক উল্লেখ করে থাকে। অন্যদিকে **ব্র্যাক টেকনিক্যাল ম্যানুয়েল (১৯৯৭)**-এ ক্ষমতায়নের বৈশিষ্ট্যগুলোকে নিম্নোক্ত আকারে হাজির করে।

- অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবার জন্য নারীর ক্ষমতাবৃদ্ধি। যার মধ্যে আয়, নিজের সম্পদ এবং নিজের অর্থ নিয়ন্ত্রণ থাকবে।
- পরিবারে এবং সমাজে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন এবং এর পক্ষে লড়াই ও সমঝোতার যোগ্যতা বৃদ্ধি করা।
- নারীর নিজের শরীরের সময় এবং চলাফেরা– এসবের ওপর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করা।

জেন্ডার সম্পর্ক পরিবর্তন

- ক্ষমতা সম্পর্ককে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে সামাজিকভাবে নির্ধারিত নারী-পুরুষ সম্পর্ককে পুনর্গঠিত করা এবং
- রাষ্ট্রীয় এবং ব্যক্তিগত উভয় সম্পদ ব্যবহারে এবং তার ওপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকতে হবে।
- সামাজিক সংস্থা এবং সংগঠনের পুনর্গঠনে নারী-পুরুষের বিভিন্ন ধারণা অন্তর্ভুক্ত করা, যা তাদের উভয়কে উপকৃত করে।
- গার্হস্থ্য কর্মে সমাজ এবং জাতীয় কর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমান অংশগ্রহণ।

ব্র্যাক তার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য নিয়ে মূলত গ্রামীণ নারীদের ভেতরেই কাজ করে। জেন্ডার পলিসিতে উল্লেখ আছে, গ্রামীণ নারী-পুরুষরা যাতে একসাথে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। এসব ইস্যুকে চিহ্নিত করেই টেকসই উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যকে নিয়ে ব্র্যাক জেন্ডার পলিসি তৈরি করেছে।

জেন্ডার নীতিমালার উদ্দেশ্য

প্রাথমিকভাবে নারীদের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং দরিদ্র ক্ষমতায়নের লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে ব্র্যাকের যে 'জেন্ডার ক্ষমতা নীতি'র উদ্দেশ্য হলো–

- প্রত্যেকটা নীতি প্রকল্প এবং কর্মসূচিতে 'জেন্ডার এবং উন্নয়ন' এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করা।
- ব্র্যাকে নারী-পুরুষেরা যাতে কর্মক্ষেত্রে সমান শর্তে কাজ করতে পারে তার জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করা।

Dhaka University Institutional Repository

জেন্ডার কোয়ালিটি অ্যাকশন লার্নিং কর্মসূচি

ব্র্যাকের অভ্যন্তরে নারী-পুরুষের সম্পর্ক এবং উন্নয়নের মাধ্যমে কাজের পরিবেশকে গতিময় করে তোলার জন্য ব্র্যাকের প্রশিক্ষণ বিভাগ জেন্ডার কোয়ালিটি অ্যাকশন লার্নিং (জিকিউএএল) কর্মসূচি চালু করেছে। ব্র্যাকের মধ্যে জেন্ডার বিষয়ে সচেতনতা তৈরি এবং নারী-পুরুষ কর্মীর জন্য ইতিবাচক কাজের পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে এই কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। জিকিউএএল-এর বর্তমানে ২টি ক্ষেত্র– কর্মীদের জন্য ও ব্র্যাকের গ্রামীণ সংগঠনের জন্য।

জেন্ডার কোয়ালিটি অ্যাকশন লার্নিং কর্মসূচির আওতায় জেন্ডার সচেতনতামূলক নানা বিষয় সেমিনার ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। যেসব বিষয়গুলোর ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তাহলো– জেন্ডার কোয়ালিটি অ্যাকশন লার্নিং কর্মসূচির পূর্ণরূপ; জেন্ডার ও সেক্সের সংজ্ঞা এবং পার্থক্য; জেন্ডার বৈষম্যের ক্ষেত্রসমূহ; জেন্ডার বৈষম্য সৃষ্টির কারণ; জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের উপায়সমূহ; নারীর ক্ষমতায়ন; জেন্ডারভিত্তিক শ্রম বিভাজন; নারীর অবস্থা ও অবস্থান; নিজ আয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ; গৃহস্থালি কাজে যুক্তদের বাইরের কাজের চাপ প্রসঙ্গে ও পরিবার এবং সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রসঙ্গে।

জেন্ডার পলিসি, টেকনিক্যাল ম্যানুয়েলে জেন্ডার পলিসি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে দু'টি প্রকাশনার পাশাপাশি সম্প্রতি এই সংগঠন *'যৌন হয়রানিবিরোধী নীতিমালা'* প্রণয়ন করেছে। এই নীতিমালায় যেসব বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেগুলো হলো– **নারী কর্মীরা কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির শিকার; সংস্থার পক্ষ থেকে যৌন হয়রানির বিষয়টি নিয়ে কাজ করা প্রসঙ্গে; কর্মী ও সংস্থার ওপর যৌন হয়রানির প্রভাব; যৌন হয়রানিমুক্ত পরিবেশের প্রভাব; যৌন হয়রানির প্রস্তাবে রাজি না হলে নারী কর্মীরা কর্মক্ষেত্রে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়; কর্মীদের যৌন হয়রানির শিকার হয়েও বিষয়টি চেপে যাবার কারণ; ব্র্যাক ও যৌন হয়রানি নির্মূলকরণ আন্দোলন; যৌন হয়রানির সংজ্ঞা; করণীয়; নীতিমালা কাদের জন্য প্রযোজ্য। এছাড়া এই নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগসমূহ নিয়ে আলোচনা রয়েছে।** একই সাথে এই নীতিমালায় নারী-পুরুষ সদস্যদের জন্য আচরণবিধিও উল্লেখ করা আছে।

প্রশিকা

প্রশিকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং প্রশাসনে নারী অধিকারের বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া হয়। দরিদ্র নারী-পুরুষের ক্ষমতায়নের প্রশ্নটিতে কাজ করতে গিয়ে প্রশিকা তার কর্মী এবং দলীয় সদস্যদের জন্য আলাদা জেন্ডার পলিসি রয়েছে। নিচে **কর্মীদের জন্য** জেন্ডার পলিসির উদ্দেশ্য ও ক্ষেত্র উল্লেখা করা হলো।

উদ্দেশ্য

- সংস্থার সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সম্পর্কের সমতা নিশ্চিত করা।
- সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ, সমঅধিকার, সমসুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা।
- ঐতিহাসিকভাবে সৃষ্ট নারীর সামাজিক পশ্চাৎপদতা, বঞ্চনা এবং তাদের বিশেষ চাহিদাসমূহ বিবেচনা করে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- নারীর অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তনের অনুকূল শর্ত ও পরিবেশ তৈরি করা।
- জেন্ডার ও উন্নয়ন প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।

ক্ষেত্র

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে নারীকর্মীদের জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে :

- আর্থিক ও অন্যান্য বৈষয়িক সুবিধা;
- নিয়োগ, ছুটি, পদোন্নতি, পোস্টিং, বদলি, অব্যাহতি ও বরখাস্ত;
- ভৌত ও বিশেষ কিছু সুবিধা;
- কর্মী উন্নয়ন;
- নারীকর্মীদের সুনির্দিষ্ট সমস্যা এবং
- মূল্যবোধ ও আচরণ

Dhaka University Institutional Repository

দলীয় কর্মীদের জন্য জেন্ডার পলিসির উদ্দেশ্য ক্ষেত্রসমূহ উল্লেখ করা হলো।

উদ্দেশ্য

- দলীয় কার্যক্রমের সর্বস্তরে ভারসাম্যপূর্ণ সমতাভিত্তিক নারী-পুরুষ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা।
- সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান ও কার্যকরী অংশগ্রহণ ও সমভাবে সুবিধাভোগ নিশ্চিত করা।
- নারীর অবস্থা ও অবস্থান বিশ্লেষণসাপেক্ষে জেন্ডার চাহিদা নিরূপণ করে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- নারীর সার্বিক উন্নয়নের সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা।

ক্ষেত্র

- সংগঠন বিনির্মাণ কর্মসূচি
- প্রশিক্ষণ
- গণসংস্কৃতি কার্যক্রম
- সার্বজনীন শিক্ষা কার্যক্রম
- অংশগ্রহণভিত্তিক ভিডিও কর্মসূচি
- আয় ও কর্মসংস্থানমূলক কর্মকাণ্ড
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও পুনঃসৃজন কর্মসূচি
- সমন্বিত বহুমুখী নারী উন্নয়ন কর্মসূচি
- পলিসি-অ্যাডভোকেসি কর্মকাণ্ড

গবেষণায় ব্র্যাকের ক্ষুদ্র ঋণ,শিক্ষা ও অতিদরিদ্র কর্মসূচি– এ তিনটি কার্যক্রমের ওপর পর্যবেক্ষণ চালানো হয়। ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতা ও অতিদরিদ্র কর্মসূচির সকলে নারী এবং শিক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত সকল শিক্ষকই নারী। প্রশিকায় ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি থেকেই মূলত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই সংগঠনে নারী-পুরুষ উভয়ই ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতা থাকলেও নারীদের সংখ্যাই বেশি। নাগরিক উদ্যোগের সালিশ কর্মসূচিতে নারীদের অধিকারের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে কর্মসূচি সংগঠিত করা হয়েছে তিনটি সংগঠনের কর্মসূচিগুলো সম্পর্কে অর্জিত ধারণা এবং তথ্যের পর্যালোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ষ | ষ্ঠ | অ | ধ্যা | য়

এনজিওত্রয়ের প্রশাসনিক কাঠামোয় নারীর অবস্থা ও অবস্থানের পর্যালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

এনজিওত্রয়ের প্রশাসনিক কাঠামোয় নারীর অবস্থা ও অবস্থানের পর্যালোচনা

নারীর ক্ষমতায়নে এনজিওর কর্মসূচি যতটা বিস্তৃত পরিধি নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়, প্রশাসনে নারীর অবস্থা কী বা নারী-পুরুষের সমতার প্রশ্নটি কতদূর অগ্রসর হয়েছে– সে বিষয়টি মনোযোগের আড়াল থেকে ততটা সামনে আসেনি। এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে যেমন উল্লেখযোগ্য কোনো গবেষণা কর্ম দেখা যায়নি তেমনি এনজিওরা নিজেরাও প্রশাসনের অভ্যন্তরে এ বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে হাজির করতে পেরেছে তাও বলা যাবে না। অথচ এই ক্ষেত্রটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এনজিওর প্রশাসনে নারীর অবস্থা বোঝার জন্য গবেষণার অঞ্চল হিসেবে ব্র্যাকের নীলফামারীর সদর কার্যালয়, নোয়াখালীর অশ্বদিয়া ইউনিয়ন, রাজশাহীর পবা থানা, ঢাকার কামরাঙ্গীরচর এবং প্রশিকার ঢাকার ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর কার্যালয় ও নাগরিক উদ্যোগ টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি কার্যালয়ের স্থানীয় পর্যায়ে মোট ৫০ জন নারী-পুরুষ কর্মী-কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা, সাক্ষাৎকার, কেসস্টাডি গ্রহণ করে কাজ পর্যবেক্ষণ করা হয়।

এছাড়া কেন্দ্রীয় পর্যায়ের কয়েকজনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। ব্র্যাকের মধ্যে হিউম্যান রিসোর্স এন্ড এডভোকেসি বিভাগের পরিচালক আফসান চৌধুরী, এইচআরডি বিভাগের পরিচালক শিফা হাফিজা, প্রশিকার উপ-পরিচালক পারভীন মুশতারী এবং নাগরিক উদ্যোগের চেয়ারপার্সন জাকির হোসেনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নারী এবং পুরুষ সদস্যদের চিন্তা বোঝার চেষ্টা করা হয়। এছাড়া ফজলে হাসান আবেদের সাথে কথা বলতে চাইলেও দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেও অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেয়া সম্ভব হয়নি। প্রশিকার ওমর তারেক চৌধুরীর সাথে কথা বলতে চাইলে তিনি লিখিত বক্তব্য দেয়ার কথা জানান। কিন্তু সময় স্বল্পতার জন্য তাঁদের মতামত এখানে যুক্ত করা সম্ভব হয়নি।

স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং প্রশাসনিক তথ্য সংগ্রহ, প্রশাসনে নারী-পুরুষের কাজের অবস্থা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখা যায়, বর্তমানে সারা বাংলাদেশে এনজিওর প্রশাসনে এবং মাঠপর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমান সময়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নারী-পুরুষের একটা অংশের কর্মসংস্থান হয়েছে বেসরকারি সংস্থাগুলোতে। কেবলমাত্র শহুরে মধ্যবিত্তরাই নয়, এ কাজে মাঠকর্মী, স্বাস্থ্যসেবিকা, শিক্ষিকা ইত্যাদি পদে কাজ করছেন সারা দেশের গ্রামাঞ্চলের নারীরাও। এনজিওর কাজের বিস্তৃতি এখন সমগ্র বাংলাদেশে। এদের বিস্তৃত কাজের অঞ্চলে অসংখ্য নারী-পুরুষ কর্মী-কর্মকর্তাদের মধ্যে নারী-পুরুষ সম্পর্কের সমতা বিষয়টি কিভাবে কাজ করছে, এতে প্রশাসনিক উদ্যোগের ভূমিকা কতদূর– এসব বিষয় এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

এই আলোচনার প্রথমে এনজিওত্রয়ের প্রশাসনে নারী-পুরুষের অবস্থা কী তা দেখা হবে। এতে দেখা যায়, ব্র্যাকে মোট কর্মী সংখ্যা ৩২,৬৫২ জন। এর মধ্যে নারী কর্মী ৬৭৪৬। প্রশিকায় মোট কর্মী ৭,১৪৩ জন। এর মধ্যে নারী ২,৪০১ জন। নাগরিক উদ্যোগের মোট কর্মী সংখ্যা ৫৫, যার মধ্যে নারী ২৪ জন। এ সংখ্যা থেকেই বোঝা যায়, নারীদের একটা অংশ এ পেশাকে গ্রহণ করেছে। আনুপাতিক পার্থক্য এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হলেও।

Dhaka University Institutional Repository

এনজিওত্রয়ে নারীর অবস্থানের যে চিত্র পাওয়া যায় তা থেকে বোঝা যায় বর্তমানে গোটা বাংলাদেশে সরকারি প্রশাসনের বাইরে এসব প্রতিষ্ঠানে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় লক্ষাধিক নারী-পুরুষ কর্মী এনজিওতে কাজ করছে। এদের মধ্যে একটা বড় সংখ্যায় আছে নারী।

প্রশাসনের কেন্দ্রীয় কাঠামোতে নারী-পুরুষের অবস্থান

	ব্র্যাক	প্রশিকা	নাগরিক উদ্যোগ
নারী	২	২	৮
পুরুষ	১৫	৩৪	১৩
মোট সদস্য	১৭	৩৬	২১
সভাপতি/চেয়ারপার্সন	পুরুষ	পুরুষ	পুরুষ
নির্বাহী পরিচালক/ প্রধান নির্বাহী/সহ-সভাপতি	পুরুষ	পুরুষ	পুরুষ

সূত্র ব্র্যাক-২০০৪, প্রশিকা-২০০৪, নাগরিক উদ্যোগ-২০০৪

এনজিওতে নারীদের উল্লেখযোগ্য মাত্রায় অংশগ্রহণ এবং এর নারী সচেতনতামূলক কর্মসূচির দিকে নজর দিলে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগবে এরা কি 'নারী সচেতন' 'নারীবান্ধব' বা 'নারী সংবেদনশীল'? এ কারণেই কি তারা আদর্শিকভাবে নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলে বা এজন্য প্রস্তুত করে সমস্ত আয়োজন? আসলে প্রশাসনে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি কিংবা উন্নয়ন, জেন্ডার ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা, প্রশিক্ষণ ও নীতি তৈরি যে তাগিদ সম্প্রতি দেখা যায়, এর পেছনের কারণ বোঝার জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে নারীর অবস্থা কোথায় আছে তা বোঝার চেষ্টা জরুরি। নিচে সংক্ষিপ্ত পরিসরে তা আলোচনা করা হলো।

বিশ্বব্যাপী উন্নত পুঁজিবাদী শিল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, স্বীকৃত পেশায় নারী অংশগ্রহণ বাড়ছে। সেটা পুরুষের তুলনায় কম হলেও বাড়ছে। শ্রমিক হিসেবে নারীর উপস্থিতি নতুন শ্রমশক্তি হিসেবে নারীকে সামনে আনছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যত বেশি নারী সম্পৃক্ত হচ্ছে ততবেশি নারীর মজুরি, শ্রমঘণ্টা, মাতৃত্বকালীন ছুটি, গর্ভপাত, বিবাহসহ ইত্যকার অধিকার ও দেনাপাওনার প্রশ্নটা হাজির হচ্ছে। কেবল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেই নয় অনুন্নত রাষ্ট্রে বা রাংলাদেশের মতো প্রান্তস্থ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেও নারীরা সামনে আসছে স্বীকৃত পেশায়। গার্মেন্টস শ্রমিকসহ অস্থায়ী ও ভাসমান নানা পেশায় নারী শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

একদিকে নতুন শ্রমশক্তি হিসেবে নারীর বিশ্বব্যাপী উপস্থিতি অন্যদিকে আমাদের দেশের মতো রাষ্ট্র মধ্যবিত্তের আর্থিক জীবনের কাঠামোগত পরিবর্তন এ বিষয়ে লক্ষণীয়। এনজিওর কাজে যারা যুক্ত হচ্ছেন আত্মসচেতনতা বৃদ্ধির কারণে যুক্ত হবার বদলে প্রয়োজনের তাগিদেই যুক্ত হবার সংখ্যা বেশি। এখানে সচেতনতার হার নেই বলা যাবে না। তবে তা উল্লেখ করার মতো না।

মধ্যবিত্ত পরিবারের আর্থিক অবস্থার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এসেছে। অর্থনীতিতে একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্য মধ্যবিত্ত ছোট পুঁজির মালিকদের গ্রাস করেছে। ফলে যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবারের রূপ নিয়েছে। বর্তমান বাজারদর আর স্যাটেলাইট সংস্কৃতির প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আর এই একক পরিবারের কেবলমাত্র পুরুষ সদস্যদের আয়ের মাধ্যমে চাহিদা পূরণ সম্ভব হচ্ছে না। ফলে প্রয়োজনের তাগিদেই নারীর শিক্ষা গ্রহণ বিয়ের বাজারের দরবৃদ্ধির দেয়াল পেরিয়ে কর্মসংস্থানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে দেখা যায়। ফলে নারীদের যুক্ত হতে দেখা যায়, সরকারি প্রশাসনের বাইরে এনজিও ক্ষেত্রে।

নারীদের অংশগ্রহণের সামাজিক চাপ, বাজারের চাহিদা, সমাজের অর্ধেক শ্রমশক্তিকে কার্যকরভাবে উন্নয়নের স্রোতে যুক্ত করা, বিশ্বব্যাপী নারীর অবস্থা– এসব বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখলে দেখা যায় 'নারী প্রশ্ন' বর্তমানে 'উন্নয়ন' জগতেও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আকারে হাজির হয়েছে। সমাজে নারীর অবস্থা বাদ দিয়ে সমাজের অগ্রগতি নিরূপণ করা সম্ভব নয়। ফলে অবশ্যম্ভাবীভাবে সামনে আসা 'নারী প্রশ্ন'কে যুক্ত না করে এখন উন্নয়ন জগতেরও একপা অগ্রসর হবার সুযোগ নেই। প্রয়োগ যে মাত্রায়ই থাকুক কাগজে-কলমে নারী প্রশ্ন উর্ধ্বে তোলা ছাড়া কোনো

Dhaka University Institutional Repository

বেসরকারি এমনকি সরকারি সংস্থার পক্ষে নিজেকে 'আধুনিক' দাবি করা সম্ভব নয়। এসব বিষয়ের সাথে এনজিওত্রয়ের কর্মসূচি বা সংগঠনের অভ্যন্তরে নারী প্রশ্নের গুরুত্বের পেছনে আরেকটি কারণ হচ্ছে দাতাসংস্থার চাপ, শর্ত। অধিকাংশ এনজিও বিদেশী অনুদানের ওপর নির্ভর করে কর্মসূচি চালায়। ফলে এ বিষয়টিতে তাদের লক্ষ্য রাখতে হয়। বর্তমানে ব্র্যাকে বিদেশী বিনিয়োগের হার কমে আসলেও তা দাঁড়িয়েছে শতকরা ২৩ ভাগে। আশির দশক পর্যন্ত ব্র্যাকের বিদেশী বিনিয়োগ ছিল উল্লেখযোগ্য পরিমাণ। নব্বই দশক থেকে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান দাঁড় করিয়ে নিজস্ব আয় বৃদ্ধির কাজ ত্বরান্বিত হয়। প্রশিকায় বর্তমান সরকার আমলে (২০০০-২০০৬) বিদেশী বিনিয়োগের হার শূন্য হলেও বিগত সরকারের আমলে তা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ছিল। আর নাগরিক উদ্যোগে ১০০ ভাগই বিদেশী বিনিয়োগ। ফলে উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎকারের সময় তারা জানান, নারীদের বেশি যুক্ত করা বা নারী প্রশ্নে সংগঠনের কর্মসূচি সজ্জিত করার পেছনে বর্তমান সময়ের চাহিদার ব্যাপারটি যেমন কাজ করছে তেমনি ডোনারদের চাপ বা শর্ত বসিয়ে দেয়ার বিষয়টিও কোথাও কোথাও অধিকমাত্রায় কাজ করছে। প্রকল্প অনুমোদনের সময় ডোনাররা শর্তারোপ করে মধ্য বা উচ্চপর্যায়ে নির্দিষ্ট হারে নারীদের নিতে হবে। এই শর্তগুলো সবসময় কার্যকর না হলে এই চাপ থাকে– এ বিষয়গুলোই এনজিওর প্রশাসনে নারী প্রশ্নকে গুরুত্ব দেয়ার বিষয়টি সামনে এনেছে কার্যত তা যে পর্যায়ে থাকুক।

প্রশাসনে নারীর অবস্থা পর্যালোচনা

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে নারী প্রশ্ন কীভাবে সামনে আসছে এ বিষয়ে আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। একই সাথে এনজিওর কর্মসূচি ও প্রশাসনে নারী প্রশ্ন অধিকমাত্রায় যুক্ত হবার কারণও আলোচিত হয়েছে। এই আলোচনার তাৎপর্যের জায়গা থেকেই এনজিওত্রয়ের প্রশাসনের অভ্যন্তরে নারী-পুরুষ অবস্থা পর্যালোচনা গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য দরকার প্রথমে এনজিও কর্মী-কর্মকর্তাদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা বোঝা।

	ব্র্যাক		প্রশিকা		নাগরিক উদ্যোগ	
প্রশাসনে নারী-পুরুষের অনুপাত	৩২৬৫২		৭১৪৩		৫৫	
	নারী ৬৭৪৬	পুরুষ ২৫৯০৬	নারী ২৪০১	পুরুষ ৪৭৪২	নারী ২৪	পুরুষ ৩১

সূত্র ব্র্যাক-২০০৪, প্রশিকা-২০০৪, নাগরিক উদ্যোগ-২০০৪

আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

প্রশাসনে যারা আছেন, তাদের প্রত্যেকের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এক নয়। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে এর ভিন্নতা নজরে পড়ে বেশি। এক্ষেত্রে দেখা যায়, স্থানীয় পর্যায়ে যারা কাজ করছেন তাদের মধ্যে নারী-পুরুষ উভয় কর্মীরা মফস্বল শহর থেকে পড়াশোনা করা মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য। একাডেমিক অবস্থাও এদের গড়পড়তা সাধারণ। কেন্দ্রীয় পর্যায়ের অধিকাংশ নারী-পুরুষ সদস্যরা ঢাকা বা বিভাগীয় শহরে বেড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য। যাদের শিক্ষাগত সাধারণের ওপরে। মাঠপর্যায়ে স্কুল শিক্ষিকা, মাঠকর্মীদের মধ্য থেকে আসাদের মধ্যে এসএসসি/এইচএসসি পাস করা নারী-পুরুষের সংখ্যাই বেশি। এইচএসসি থেকে মাস্টার্স পাস নারী-পুরুষ কর্মসূচি সংগঠক হিসেবে কাজ করে। এদের একাডেমিক অবস্থাও সাধারণ। ফলে দেখা যায়, শহরে এবং মফস্বলে অবস্থানকারীদের অধিক সুবিধাপ্রাপ্তি এবং সাংস্কৃতিক প্রকাশের ভিন্নতার কারণে তাদের আচরণ-কৌশলের তারতম্য। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য তেমন একটা নেই বললেই চলে।

প্রশাসনে নীতিনির্ধারণে নারী-পুরুষের অবস্থা

নীতিনির্ধারণে নারী-পুরুষের অবস্থা পর্যালোচনার সুবিধার্থে এনজিওত্রয়ের অর্গানোগ্রাম ও কেন্দ্রীয় কাঠামোয় উল্লেখ করা হলো। এনজিওত্রয়ের কাঠামোর দিকে লক্ষ্য করলেই একটা চিত্র ভেসে ওঠে। প্রশাসনিক কাঠামোয় নারী-পুরুষের অবস্থান বোঝার জন্য প্রথমেই সংগঠনের অর্গানোগ্রামের দিকে নজর দিলে (পরিশিষ্টতে অর্গানোগ্রাম সংযুক্ত) দেখা যায়, পদসোপানের গুরুত্বের দিক দিয়ে নারীর অবস্থান দুর্বল।

Dhaka University Institutional Repository

ব্র্যাকে কেন্দ্রীয় কাঠামোয় নারী-পুরুষের অবস্থান কিভাবে আছে তা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে দেখা যায়, ১৭ জনের কেন্দ্রীয় কাঠামোয় কেবল মাত্র ২ জন নারী আছে। একজন এইচআরডি ও অন্যজন আড়ংয়ের পরিচালক। এছাড়া এখানে চেয়ারপার্সন পুরুষ। নির্বাহী পরিচালক পুরুষ। উপনির্বাহী পরিচালক সবাই পুরুষ।

প্রশিকার ব্যস্থাপনা কাঠামোয় (২০০০) সদস্য সংখ্যা মোট ৩৬ জন। তার মধ্যে মাত্র ২ জন নারী। এই কাঠামোয় সভাপতি পুরুষ। সহ-সভাপতি পুরুষ। পরিচালকদের ৯ জনই পুরুষ। আর নির্বাহী পরিচালকের ২৪ জনের মধ্যে মাত্র ৩ জন নারী।

নাগরিক উদ্যোগের কেন্দ্রীয় কাঠামো ২১ জনের। তার মধ্যে ৮ জন নারী, বাকিরা পুরুষ। সংগঠনের চেয়ারপার্সন, প্রধান নির্বাহী পুরুষ। সহকারী নির্বাহী নারী। ব্যবস্থাপনা বোর্ডে ৯ জনের মধ্যে ৪ জন নারী। এ থেকে বোঝা যায়, এনজিও প্রশাসনে কেন্দ্রীয় কাঠামোতে এখন পর্যন্ত নারীর অবস্থা শক্তিশালী নয়। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে এনজিও প্রতিনিধিরা বলেন, নানারকম প্রতিবন্ধকতার কারণে অধিকাংশই নারী 'পেশা'র ক্ষেত্রে ক্যারিয়ারের তুলনায় প্রয়োজনের তাগিদ বেশি অনুভব করেন। ফলে চাইলেও নারীদেরকে প্রশাসনের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে আনা সম্ভব হয় না। ক্যারিয়ার হিসেবে পেশাকে গ্রহণ করা এবং সেই পেশায় নিজের পদোন্নতির জন্য চেষ্টা করে নিজেকে আরো দক্ষ, অভিজ্ঞ করে তোলার বিষয়টি খুব অল্পসংখ্যক মেয়েদের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। এখন পর্যন্ত এনজিও জগতে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিত্ব পর্যায় নারীদের সংখ্যা হাতেগোনা এবং এই হাতেগোনাদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত পরিবারের শহুরেরা। এদেরকে দেখে প্রশাসনের ব্যক্তিপর্যায়ে নারীদের কিছুটা উন্নতি বা সমাজের সীমা ডিঙানো মনে হতে পারে; কিন্তু সামগ্রিক পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, সামষ্টিকভাবে তেমন কোনো পরিবর্তন আসেনি।

রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্র থেকে প্রশাসনিক কার্যক্রম পর্যন্ত এনজিওরা যে সমতার কথা বলে সেটা স্থানীয় পর্যায়ে কিছুটা থাকলেও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে তা নেই। সংখ্যার দিক থেকে নয়, গুণগত দিক বিবেচনায় স্থানীয় বা মাঠপর্যায়ে নিচের দিকে কর্মীদের কাজ পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, একই ধরনের পদে নারী ও পুরুষ উভয়ই আছে। সেটাও সংখ্যায় কম। কিন্তু কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সেটা নেই বললেই চলে। এর কারণ হিসেবে কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে নারী এবং পুরুষদের আলোচনার পার্থক্য লক্ষণীয়। অনেক বিষয়ে তাদের মতামত অভিন্ন হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের মতামতের ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়।

আফসান চৌধুরী এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "নারীদের কাজ করার ক্ষেত্রে বিভিন্নরকম কোটা দিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু দেখা যায়, কাজ করার সময় যোগ্যতার বাইরে মেয়েদের তুলে আনলে সমস্যা আরো বাড়ে। কাজ করার ক্ষেত্রে যে মানবিকতা প্রয়োজন তা ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের বেশি। ছেলেরা কোনো কিছু খুব এগ্রিসেভলি করতে পারে। আমাদের এনজিও বা সরকার বিভিন্ন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে যে নারীদের খুব একটা শ্রদ্ধা করতে শিখেছে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না, অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে এমনটাও দেখা যায় না। প্রতিষ্ঠানগুলো অত্যন্ত পুরুষকেন্দ্রিক এমনকি যেসব প্রতিষ্ঠান নারীদের জন্য বলে, তারাও পুরুষকেন্দ্রিক। নিরাপত্তা আর উন্নতি– এ দুয়ের মধ্যে বৈরী সম্পর্কের কারণে মেয়েরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। কাজ করার ক্ষেত্রেও মেয়েদের সেসব কাজ দেয়া হয় যেখানে তার উন্নতির সম্ভাবনা কম।"

শিফা হাফিজা বলেন, "প্রজেক্টের ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন যতটা গুরুত্ব পেয়েছে সংস্থার ভেতরে তা পায়নি। সংগঠনের ভেতরে এ বিষয়টি আসলেও এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে মনোযোগ যথেষ্ট অবহেলিত। সংগঠনের অভ্যন্তরে এখনো মেকানিজম ডেভেলপ করেনি। ২/১ জন যারা নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে এসেছে, তারা লড়াকু হিসেবে উঠে এসেছে, অনেক লড়াই করে জায়গা করে নিয়েছে। এর সংখ্যা খুবই কম।"

জাকির হোসেন বলেন, "উচ্চপর্যায়ে নারীর যোগ্যতা থাকলেই আসা উচিত। তাদের উৎসাহিত করা উচিত। কিন্তু বিভিন্ন সংগঠনে যেমন মেয়েরা পরিবারের বদলে সংগঠনে ক্যারিয়ার গঠনে মনোযোগ দিতে গিয়ে সংসার ছাড়তে হচ্ছে, এটা ঠিক নয়। মেয়েদের সংসার এবং কাজ এ দুয়ের মধ্যে ব্যালেন্স করে দুটোকেই গুরুত্ব দিতে হবে। যাতে করে কোনোটার মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত তৈরি না হয়।"

প্রতিনিধিদের বক্তব্য থেকেও প্রশাসনে নারী প্রশ্ন কোন অবস্থায় আছে তার চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রশাসনে কাজ পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, নিচের পর্যায়ে কিছু সমতা থাকলেও উচ্চপর্যায়ে বা নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নারীদের উপস্থিতি নজরে পড়ার মতো নয়। পদোন্নতির ক্ষেত্রেও নারী পেছনে। অন্যদিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াই এনজিও কিংবা 'উন্নয়ন' জগতের কোথাও এখনো গণতান্ত্রিক হয়নি বলে জানান এনজিও প্রতিনিধিরাও। অধিকাংশ

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় একক বা গোষ্ঠী আধিপত্যের প্রবণতা প্রধান। ফলে অনিবার্যভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ অনুল্লেখ্য।

নীতিনির্ধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব পালন ও যোগ্যতার ভিত্তিতে ওপরে উঠে আসা– এসব বিষয়ে প্রশাসনে নারীর অবস্থা মজবুত নয়। এনজিও প্রতিনিধিদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, নারীর কাজের সীমানা বা শ্রেণীকরণের নির্দিষ্টতা টানতে। ক্যারিয়ার হিসেবে নারী পেশাকে নিতে না পারার পেছনে পারিবারিক দায়ভারের প্রশ্নটিই সামনে এনেছেন অধিকাংশ পুরুষ কর্মী-কর্মকর্তা। এ বিষয়ে আফসান চৌধুরী বলেন, "নারী-পুরুষ সমান নয়। নারীদের পরিবারের দায়িত্ব পালন করতে হয়। আর সে কারণে প্রশাসনে নারী-পুরুষের কাজ করার বাস্তবতা সুযোগ-সুবিধা দেখে ইক্যুয়িটি নির্ধারণ করা দরকার।" নারী প্রতিনিধিরা এই সমস্যা তুলে ধরলেও তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং আশা করেন, এমন পরিবেশ যেখানে নারী-পুরুষ উভয়ই সমানভাবে পরিবার এবং কার্যালয়ে অংশগ্রহণ করতে পারে সে বিষয়ের ওপর।

বেতন ও ছুটি প্রসঙ্গ

এনজিওগুলোতে বেতন কাঠামো নারী-পুরুষ সকলের জন্যই সমান। এখানে পদস্তর অনুযায়ী নির্ধারিত করা হয়। তবে এনজিও কর্মীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, মাঠপর্যায়ে স্তরের ভিন্নতা সত্ত্বেও মোটামুটি একই ধরনের কাজ বিভিন্ন স্তরের কর্মীরা করে থাকেন। অর্থাৎ এমএ পাস (ব্র্যাকের ৭ম স্তর) এবং এইচএসসি পাস (ব্র্যাকের ৪র্থ স্তর) উভয়ই চাকরির প্রাথমিক পর্যায়ে যদি ক্ষুদ্র ঋণ বা শিক্ষা কার্যক্রমের মাঠকর্মী হয় তাহলে তাদের কর্মসূচি সংগঠক হিসেবে সমিতি থেকে কিস্তি তোলা বা দিনে ৫টি স্কুল পরিদর্শনের কাজ করতে হয়।

মাতৃত্বকালীন ছুটি ব্র্যাকে সবেতনে ৪ মাস, পুরুষ সদস্যের জন্য ৩ দিন। প্রশিকায় সবেতনে ৪ মাস, পুরুষ সদস্যের জন্য ১০ দিন। নাগরিক উদ্যোগে নারী কর্মীদের সবেতনে ৪ মাস, পুরুষ সদস্যের জন্য ১৪ দিন। শ্রমঘণ্টা এবং সাপ্তাহিক ছুটির ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও স্থানীয় পর্যায়ে পার্থক্য দেখা যায়। আন্তর্জাতিক শ্রম আইন অনুযায়ী ৮ ঘণ্টা শ্রমঘণ্টা নির্ধারিত আছে। কিন্তু বেসরকারি সংস্থাগুলোতে কেন্দ্রীয় কার্যালয় এবং স্থানীয় কার্যালয়ে শ্রমঘণ্টা, সাপ্তাহিক ছুটির পার্থক্য আছে। যেমন ব্র্যাকে দেখা যায়, কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে শুক্র ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি; কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ে কেবল শুক্রবার ছুটি। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অফিসের সময় সাড়ে ৮টা থেকে সোয়া ৫টা। মাঝখানে ১ ঘণ্টা বিরতি। আর স্থানীয় পর্যায়ে কাগজে ৮টা-৫টা থাকলেও কর্মীরা সন্ধ্যা ৭-৮টা এমনকি কখনো কখনো ১০-১১টার আগে অফিসে থেকে ছাড়া পায় না। কেবল ব্র্যাক নয়, প্রশিকাতেও অবস্থা একই রকম।

কাজের পরিবেশ ও প্রশিক্ষণের ফলাফল

বর্তমান সময়ে এনজিও'র অন্যতম কর্মসূচি 'নারীকে' ঘিরে। ফলে প্রশাসনে নারীর অংশগ্রহণ ফলপ্রসূ করে কাজের পরিবেশকে শক্তিশালী এবং নারী-পুরুষ সম্পর্কে সমতা আনার লক্ষ্য নিয়ে এসব সংস্থায় রয়েছে বিভিন্ন নীতিমালা যেমন– জেন্ডার নীতিমালা, যৌন হয়রানিবিরোধী নীতিমালা, জেন্ডার কোয়ালিটি অ্যাকশন লার্নিং প্রোগ্রাম, আচরণ বিধি ইত্যাদি। এসব এনজিও কর্মসূচির আওতায় থাকার বিষয়টি এখন স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ফলে প্রত্যেক এনিজও কর্মীরা এসব শব্দের সাথে পরিচিত। কিন্তু কেন্দ্রীয় পর্যায়ে এসব শব্দ এবং এর কার্যকারিতা সম্পর্কে নারী-পুরুষ কর্মীরা যতটা ধারণা রাখেন স্থানীয় পর্যায়ে তা রাখেন না। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নানারকম নীতিমালা করার ক্ষেত্রে ডোনারদের মনোযোগ, বর্তমান বিশ্বে নারী প্রশ্নের গুরুত্ব– এ বিষয়গুলো যতটা মনোযোগে থাকে ততটা প্রায়োগিক দিকে থাকে না। এমনকি ডোনারদের কাছে জবাবদিহিতা ও স্পষ্টতার জন্য সংস্থাসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে শুরু করে অধিকাংশ নীতিমালা ইংরেজি ভাষায় রচনা করা হয়।

স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত নীতিমালা পৌঁছলেও প্রয়োগ সমান নয়। যেমন– ব্র্যাকের ৪টি অঞ্চল রাজশাহী, নীলফামারী, নোয়াখালী ও ঢাকার কামরাঙ্গীরচরের মধ্যে দেখা যায় জিকিউএএল (জেন্ডার কোয়ালিটি অ্যাকশন লার্নিং) কর্মসূচি কেবল রাজশাহীতে মাসান্তরে অনুষ্ঠিত হয়। অন্য দু'টি কাজের অঞ্চলে জিকিউএএল-এর কোনো কর্মসূচি সম্পর্কে কর্মকর্তারা পরিষ্কার ধারণা রাখেন না। রাজশাহীর পবা থানার কর্মাঞ্চলে জিকিউএএল-এর ট্রেনিং পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, অংশগ্রহণকারীদের এক-চতুর্থাংশ হচ্ছেন নারী। আর যিনি প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন তিনি একজন পুরুষ। এ প্রশিক্ষণে এ বিষয়ের গুরুত্ব, জেন্ডার সেক্সের সংজ্ঞা, জেন্ডার বৈষম্যের ক্ষেত্র, এর কারণ দূর করার পথ ইত্যাদি নিয়ে একাডেমিক আলোচনা হয়। দেখা যায়, আলোচনায় অংশগ্রহণে পুরুষরা সক্রিয়। নারীরা অতটা সরব

Dhaka University Institutional Repository

নয়। নারী-পুরুষ যারা অংশগ্রহণ করেছেন তারা অফিসের আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজনেই উপস্থিত হয়েছেন বলে প্রতীয়মান হয়।

নারী বিষয়ে প্রত্যেকের আগ্রহ, প্রশ্ন থাকলেও যে অবস্থার মধ্যে তারা থাকে তাতে প্রশিক্ষণে প্রত্যেকেরই মনোযোগ নিবিষ্ট থাকে না। পাশাপাশি তাত্ত্বিক আলোচনার বাস্তবিক প্রয়োগের বড় রকম ঘাটতি এসব বিষয়ে পরিপূর্ণ আগ্রহ তৈরিতে বাধা সৃষ্টি করে কর্মীদের মধ্যে এ বিষয় কেবল পর্যবসিত হয়েছে আনুষ্ঠানিকতায়। ক্ষুদ্র ঋণ বা অতিদরিদ্র কর্মসূচির সংগঠক সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কিস্তি তুলে বা গ্রামীণ দরিদ্রদের গবাদিপশু বা অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে এসে ক্লান্ত থাকেন। ক্লান্তি কাটতে না কাটতে ১ ঘণ্টা খাদ্য বিরতির পর কাজে নামতে হয়। যেদিন জিকিউএএল থাকে সেদিন দুপুরে তাদের সকলের কাজ থাকে জিকিউএএল-এ বসা। জিকিউএএল রাজশাহীর কর্মসূচিতে দেখা যায়, 'নারী বিষয়' যেরকম গুরুত্ব নিয়ে আলোচিত হবার কথা তেমন গুরুত্ব নিয়ে আলোচিত হচ্ছে না। অর্থাৎ প্রশিক্ষক তার নির্ধারিত ব্যাখ্যা বক্তৃতা করেন ঠিকই। কিন্তু তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অংশগ্রহণ দেখা যায় না। কর্মীদের মধ্য থেকে কিছু প্রশ্ন উঠে আসলেও দেখা যায়, আলোচনা পরিণত হয়েছে হাসি ও সূক্ষ্ম ঠাট্টার বিষয়ে।

নারী প্রশ্নে এনজিও'র প্রশিক্ষণ থাকা সত্ত্বেও গবেষণায় মাঠপর্যায়ে দেখা যায়, কাজের পরিবেশে নারী-পুরুষের সম্পর্ক আগের তুলনায় স্বাভাবিক এবং কিছুটা স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে। কিন্তু একজন পুরুষ সহকর্মী অপর নারী কর্মীকে প্রথমে সহকর্মী তারপর নারী না ভেবে বরং উল্টোটাই ভাবেন। নারীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও নারীকে অসহায়, অদক্ষ, সীমায়িত ইত্যাদির আলোকে বিবেচনা করা হয়। এ বিষয়টি বেশি লক্ষ্য করা যায় স্থানীয় পর্যায়ে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে এ সমস্যা থাকলেও তার প্রকাশ প্রকট নয়।

প্রশিক্ষণ সম্পর্কে এনজিও কর্মীদের সাথে আলোচনা করলে তারা বলেন, এসব কাগজে-কলমে থাকলেও নারীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির বদল হয়ে গেছে বলা যাবে না। এখনো অধিকাংশ পুরুষ কর্মীদের স্ত্রীরা গৃহিণীর চৌকাঠ থেকে বের হয়নি। আর অধিকাংশ স্থানীয় পর্যায়ের নারী কর্মীরা যারা বিবাহিত তারা মনে করেন, স্বামীর সচ্ছলতা আসলে চাকরি ছেড়ে দেবেন। আবার অবিবাহিত কর্মীদের মধ্যে কাজের আগ্রহ দেখা যায়; কিন্তু কেউই পারিবারিক সিদ্ধান্তের বাইরে যেতে রাজি নন। এ সিদ্ধান্ত পিতা বা স্বামী দ্বারা নির্ধারিত। তারা মনে করেন, সম্মানের জন্য, আর্থিক স্বাতন্ত্র্যের জন্য পেশা দরকার; কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের অবনতি করে বা স্বামী-শ্বশুরবাড়ির অনিচ্ছায় চাকরি করলে ঝামেলা বাড়ে। এ দৃষ্টিভঙ্গি কেবল ব্র্যাকের নয়, প্রশিকা, নাগরিক উদ্যোগের মাঠকর্মীদেরও। অধিকাংশই চাকরি করেন, একার আয়ে সংসার চলে না এ কারণে অথবা সচ্ছলতা আনার জন্য। এর মধ্যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কেউ কেউ আছেন, যারা স্বাধীন চিন্তা করতে আগ্রহী, যারা আত্মমর্যাদা ও সচেতনতাসহ লড়াই করে প্রশাসনের বিভিন্ন জায়গায় স্থান করে নিয়েছেন। কিন্তু এর সংখ্যা খুবই কম। টিকে থাকা এ গুটিকয়েকের ব্যাপক সংগ্রাম পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অব্যাহতভাবে চলছে। সামগ্রিক পর্যায়ে যে সংগ্রাম অনুপস্থিত।

কর্মসন্তুষ্টি প্রসঙ্গে

কর্মসন্তুষ্টি প্রসঙ্গে কেন্দ্র ও স্থানীয় পর্যায়ে মতামতের ভিন্নতা দেখা যায়। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নারী-পুরুষ কর্মী-কর্মকর্তাগণ কাজের পরিবেশ এবং কর্মসন্তুষ্টির বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব রাখেন। তাদের মতে, বর্তমানে এনজিওরা নারীদের কাজের সুযোগ করে দিয়েছে এবং কাজকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে নারী-পুরুষের যৌথ সমন্বয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করে এগিয়ে গেছে।

স্থানীয় পর্যায়ে বিশেষভাবে মাঠকর্মীরা এনজিওর কাজ করে দরিদ্র নারী-পুরুষের সহায়তামূলক কাজে যুক্ত হতে পেরে স্বস্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ে কাজের ক্ষেত্রে শ্রমঘণ্টা, পদোন্নতি, ছুটি এগুলো যথাযথ নিয়মে না হওয়ায় তাদের ভোগান্তি নজরে পড়ে। নারী-পুরুষ উভয় কর্মীরা সকাল সাড়ে ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা, কখনো রাত ৮টা-৯টা পর্যন্ত কাজ করে ক্লান্ত থাকেন। তাদের পক্ষে বিনোদন, অবসর যাপন কিংবা অন্য কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ করা সম্ভব হয় না।

দেখা যায়, ব্র্যাকে ঢাকা শহরের বাইরে ৭ম স্তরের নারী-পুরুষ কর্মীরা কার্যালয় থেকে যাতায়াতের জন্য হোন্ডা পান। কিন্তু এ থেকে নিচের স্তরের কর্মীদের সাইকেল চালাতে হয়। প্রতিদিন সাইকেল চালিয়ে ১০-১২ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে কিস্তি তুলতে যান তারা অথবা স্কুল পরিদর্শন অথবা মাঠের অন্য কাজ করেন। হোন্ডা চালিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

মাঠের কাজ পরিদর্শন করতে গেলে প্রথমদিকে গ্রামে উৎসুক দৃষ্টি লক্ষ্য করা গেছে। নানারকম বক্তব্যও শুনতে হতো নারীদের।

বর্তমান সময় এই কটূক্তির হার কিছুটা কমেছে। শহর অঞ্চলে ৭ম স্তর ব্যতীত বাকিদের জন্য সাইকেলের ব্যবস্থা আছে। ৭ম স্তরের হোন্ডা কার্যালয় সরবরাহ করে। আর এর নিচের স্তরের কর্মীদের যাতায়াত বাবদ কোনো খরচ বা সাইকেলের অর্থ প্রতিষ্ঠান প্রদান করে না। গ্রামাঞ্চলে সাইকেল চালিয়ে কাজ করার পরিবেশ থাকলেও ঢাকায় বা শহরাঞ্চলে নারীদের সাইকেল চালিয়ে কাজ করার বিয়য়ে উৎসাহ তেমন একটা দেখা যায় না। এর কারণ হিসেবে এনজিও কর্মীরা বলেন, শহরে হোন্ডা চালালেই মেয়েদের দিকে অন্যভাবে তাকানো হয় এবং এদের নিয়ে পুরুষদের অপ্রয়োজনীয় কৌতূহল দেখা যায়। কিন্তু সাইকেল চালানোটা আরো অবাস্তব কারণ, সাইকেল চালানোর চল নেই শহরে বিশেষভাবে নারীদের।

ব্র্যাক ও প্রশিকার স্থানীয় পর্যায়ে লক্ষ্য করা যায়, ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতাদের ঋণ তোলা এবং চাকরি রক্ষায় জবাবদিহিতার চাপ এতটাই থাকে যে কর্মীরা সারাক্ষণ কিস্তি তোলার চিন্তা ছাড়া অন্য কিছু করতে পারেন না। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাজ আদায়ের চাপ এতটাই থাকে যে কর্মীরা কখনো কখনো নিজের পকেট থেকে গ্রাম সদস্যদের কিস্তি পরিশোধ করতে বাধ্য হয়। কখনোবা বেতনের অংশ দিয়েও পরিশোধ করেন। এই অবস্থা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য। অধিকাংশ কার্যালয়ে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে ওই সময়েও ফুরসত মেলে না। এর মাঝেও কাজের আলোচনা চলে। কোনোমতে খেয়ে কর্মীরা আবার বেরিয়ে পড়েন। কিস্তি তোলা, স্কুল পর্যবেক্ষণের রিপোর্ট দেয়া, টিইউপি সদস্যদের পরস্থিতি ফলোআপ করা– এসব করতে গিয়ে সার্বক্ষণিকভাবে তাদের কাজের মধ্যেই থাকতে হয়। এর বাইরে চিন্তা করারও সময় পান না। যারা কার্যালয়ের আবাসে থাকেন তাদের অবস্থা আরো নড়বড়ে।

এনজিও কার্যক্রমে বিভিন্ন জেলায় নারী-পুরুষরা কাজ করেন। স্থানীয় পর্যায় থেকে শিক্ষক ছাড়া কোনো রিক্রুটমেন্ট হয় না। ফলে এনজিও সদস্যদের হয় কার্যালয়ে, না হয় এলাকায় বাসা ভাড়া করে থাকতে হয়। পরিবারের সাথে অবস্থান করতে না পারায় কর্মীদের মধ্যে সবসময় ছুটির তাগাদা দেখা যায়। একই সাথে দীর্ঘদিন পরিবার-পরিজন ছাড়া অবস্থায় কোনো কাজ নিয়ে যাবার কারণে তাদের মধ্যে নানা অসন্তোষ, কাজের প্রতি অমনোযোগ সৃষ্টি হয়। নিজের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির চেয়ে কোনোমতে কাজ সম্পন্ন করা প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। যাতে নিজস্ব সৃজনশীলতার যোগ ঘটে না। নারী কর্মীদের এ বিষয়ে দুর্বলতা বেশি লক্ষ্য করা যায়।

নারী-পুরুষ উভয় কর্মীর মধ্যে নারীদের কাজের প্রতি আগ্রহ ও সৃজনশীলতা কম লক্ষ্য করা যায়। এর কারণ হিসেবে নারীদের চিন্তার দুর্বলতা দেখানো হলেও আসলে বিষয়টি ভিন্ন। যদি নারী এবং পুরুষ উভয় কর্মীর কাজের পরিমাপ করা হয় তাহলে দেখা যাবে, একজন নারী এনজিও কর্মী সারাদিনে অধিক পরিশ্রম করেন। প্রত্যেক কর্মজীবী নারীকে পেশার বাইরে গৃহব্যবস্থাপনার কাজ যেমন– ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, খাবার তৈরি, শিশু লালন-পালন ইত্যাদি করতে হয়। কিন্তু পুরুষ কর্মীর বেলায় সেটা না ঘটায় নারীর শ্রমঘণ্টা বৃদ্ধি পায়। যার দরুন নির্দিষ্ট পেশায় পুরুষের তুলনায় নারীদের আগ্রহ, মনোযোগ কম থাকে। ফলে নারীদের পদোন্নতিও ধীরে হয়। এসব প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার নেই।

উপরোক্ত ক্ষেত্রে এনজিওত্রয়ের কাজের পর্যালোচনা ও অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়, এনজিও প্রশাসনে নারী প্রশ্ন এখনো গুরুত্বের সাথে হাজির হয়নি। যতটা হয়েছে কর্মসূচিতে। ফলে প্রশাসনে নীতিনির্ধারণী ক্ষেত্রে নারীর অবস্থানও এখনো সরব নয়। এখনো প্রশাসনে নারীরা মানুষ হিসেবে, ব্যক্তি হিসেবে নিজেদের যোগ্যতা, দক্ষতা, সৃজনশীলতার তাৎপর্যপূর্ণ প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হননি এবং প্রশাসনের দিক থেকেও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধনের কোনো কার্যকর উদ্যোগ তৈরি হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

স | প্ত | ম | অ | ধ্যা | য়

প্রাপ্ত তথ্যের ফলাফলের ভিত্তিতে এনজিওত্রয়ের কার্যক্রমের আওতাভুক্ত নারীর অবস্থা ও অবস্থান পর্যালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

প্রাপ্ত তথ্যের ফলাফলের ভিত্তিতে এনজিওত্রয়ের কার্যক্রমের আওতাভুক্ত নারীর অবস্থা ও অবস্থান পর্যালোচনা

গবেষণায় ৩টি এনজিও কর্মসূচিতে নারীর অংশগ্রহণে ক্ষমতায়নের রূপ কী লাভ করেছে তা পর্যবেক্ষণ করা হয় ৩টি এনজিওর বিভিন্ন কর্মসূচিতে। কোনো কোনো কর্মসূচিতে প্রশ্নমালার মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণ প্রাধান্য পায়। আবার কোনোটিতে কেসস্টাডি, ফোকাস দল, তথ্য পর্যালোচনা স্থান পায়। বর্তমান অধ্যায়ের প্রথম ভাগে জরিপ চালানো তথ্যের ফলাফল উল্লেখ করা হবে। দ্বিতীয় ভাগে ৩টি এনজিওর কর্মসূচির সামগ্রিক পর্যালোচনা করা হবে।

মূলত ব্র্যাকের ক্ষুদ্র ঋণ ও অতিদরিদ্র– এ দু'টি কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ফলাফল সারণি পর্যালোচনা করা হলো। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিতে মোট ৫৬ জন নারী সদস্যের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যার মধ্যে ৪৪ জনের তথ্য সারণিসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে। বাকি ১২ জনের মধ্যে ৮ জন নতুন সদস্য, যারা এখনো ঋণ নেননি। ৪ জন কিশোরী কেন্দ্রের সদস্য, যারা নির্দিষ্ট 'ক্যাটাগরি'র মধ্যে পড়েন না।

অতিদরিদ্র কর্মসূচির মোট ২০ জন দরিদ্র নারীর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ফলাফলও এ অধ্যায়ের প্রথম ভাগে এ দু'টি কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ফলাফল উল্লেখ করা হলো।

৮.১ : উত্তরদাতা নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতা নারীদের মধ্যে জরিপ চালিয়ে তাদের জীবন, আর্থ-সামাজিক অবস্থাসহ বিভিন্ন দিকের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্যের মাধ্যমে এনজিও কর্মসূচির আওতাধীন নারীর ক্ষমতায়নের চিত্র এবং নারী-পুরুষের সম্পর্কের সমতার বিষয়টি কতটা অর্জিত হয়েছে তা পর্যালোচনা করা হলো।

প্রাপ্ত তথ্যে লক্ষ্য করা যায়, ঋণগ্রহীতাদের অধিকাংশ ২৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সী, এদের হার শতকরা ৫০। এছাড়া ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সী নারী আছেন শতকরা ২০ জন। ৩৫ থেকে ৪০ বছর বয়সী আছেন শতকরা ১৬ জন। এবং ৪০ বছরের ওপরে আছেন শতকরা ১৪ জন।

অধিকাংশই তাদের বয়স বলতে পারেন না। আন্দাজ করে অথবা বিয়ের বয়স, সন্তানের সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়কে মিলিয়েই এনজিও কর্মীরা এদের বয়স একটা নির্দিষ্ট করে সঞ্চয় বইতে উল্লেখ করেন।

এসব নারীর মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগ বিবাহিত। অবিবাহিত ২ জন আর তালাকপ্রাপ্ত ৩ জন। এদের মধ্যে শতকরা ৬৬ জনই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। অন্যদিকে এদের স্বামীদের মধ্যে ৫৫ ভাগ শিক্ষার সুযোগ পাননি। প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন শতকরা ১১ জন। মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন শতকরা ২৩ জন। দেখা যাচ্ছে, নারীদের মধ্যে শিক্ষার হার ৩৪ ভাগ। আর স্বামীদের মধ্যে ৪৮ ভাগ শিক্ষিত। অর্থাৎ স্ত্রীদের তুলনায় তাদের স্বামীরাই শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে বেশি।

Dhaka University Institutional Repository

নারী-পুরুষের পেশার পার্থক্যের চিত্রটি পরিষ্কার হয়েছে প্রাপ্ত তথ্য থেকে। দেখা গেছে, শতকরা ৮৬ জন নারীই কোনোরকম বাইরের উৎপাদনমূলক অর্থনৈতিক কাজে যুক্ত নয় বরং এরা সকলে গার্হস্থ্য কর্মে জড়িত।

৮.১.১ : নারী-পুরুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

	সংখ্যা	শতকরা হার
নিজ বয়স		
১৮-২৫	৯	২০
২৫-৩৫	২২	৫০
৩৫-৪০	৭	১৬
৪০+	৬	১৪
স্বামীর বয়স		
২০-৩০	১১	২৬
৩১-৪০	২০	৪৮
৪১-৫০	৮	১৯
৫০+	৩	৭
নিজ বৈবাহিক অবস্থা		
বিবাহিত	৪২	৯৬
অবিবাহিত	১	২
তালাকপ্রাপ্ত	১	২
নিজ শিক্ষাগত অবস্থা		
নিরক্ষর	২৯	৬৬
প্রাথমিক	৫	১১
মাধ্যমিক	১০	২৩
উচ্চ মাধ্যমিক	০	০
স্বামীর শিক্ষাগত অবস্থা		
নিরক্ষর	২২	৫২
প্রাথমিক	১৩	৩১
মাধ্যমিক	৭	১৭
উচ্চ মাধ্যমিক	০	০
নিজ পেশা		
গার্হস্থ্যকর্ম	৩৮	৮৭
শ্রমিক	৪	৯
ক্ষুদ্র ব্যবসা	১	২
চাকরি (চতুর্থ শ্রেণী)	১	২
স্বামীর পেশা		
কৃষি	৬	১৪
হকার	৫	১২
ড্রাইভার	১৬	৩৮
শ্রমিক	৬	১৪
ক্ষুদ্র ব্যবসা	৭	১৭
অক্ষম ও বেকার	২	৫
পরিবারে জমির পরিমাণ (শতাংশ)		
ভূমিহীন	৯	২০
১-৫	১৪	৩২
৬-১৫	১৫	৩৪
১৫+	৬	১৪

সূত্র : নিজস্ব মাঠ গবেষণা

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে পুরুষদের একজনও গার্হস্থ্য কর্ম করেন না। নারীদের মধ্যে বাকি ১৪ ভাগ হয় অন্যের বাড়িতে কাজ করেন, ধান বা কাপড়ের ব্যবসা অথবা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী হিসেবে স্কুলে আয়ার চাকরি করছেন।

পুরুষদের পেশার মধ্যে রয়েছে কৃষি (যার মধ্যে আছে ধান বিক্রি, আলু চাষ, অন্যের জমিতে বর্গা), ক্ষুদ্র ব্যবসা, হকার, শ্রমিক ইত্যাদি পেশা। তবে দরিদ্রদের মধ্যে বড় অংশই সরাসরি জমি বা কৃষি কাজের সাথে এখন

৮.১.২ : ঋণ খরচের বিভিন্ন খাত

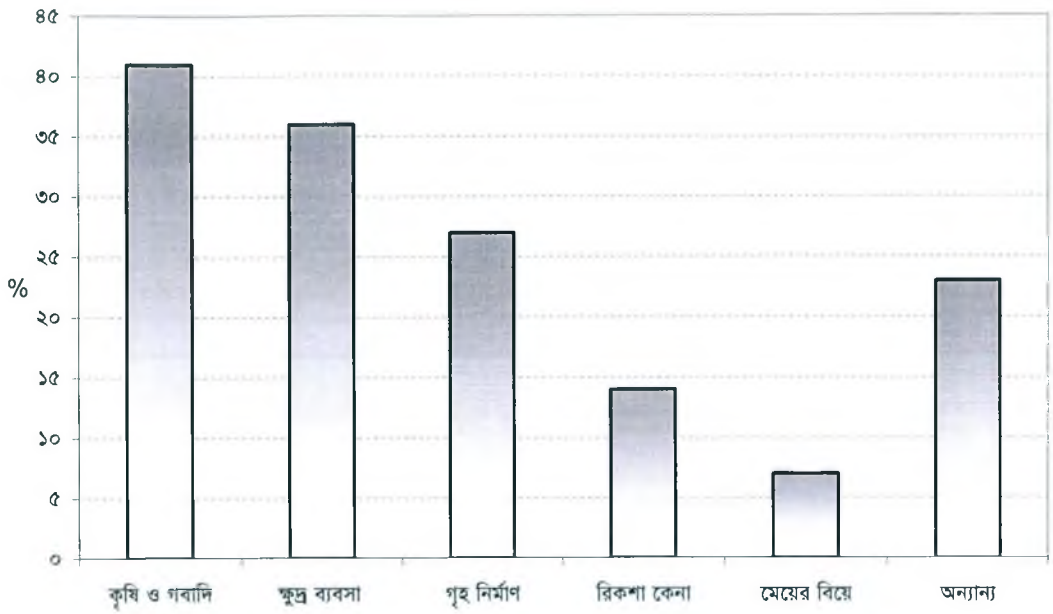

সূত্র : নিজস্ব মাঠ গবেষণা

আর নেই। প্রত্যেকের জমির পরিমাণ ১ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশের মধ্যে। যার আবার মালিকানা নারীর হাতে নয়, আছে স্বামীর কাছে। প্রাসঙ্গিকভাবে ঋণ খরচের খাতও দেখা যায় অপ্রধান কৃষি খাত, ক্ষুদ্র ব্যবসা, বাড়ি নির্মাণ, মেয়ের বিয়ের যৌতুক ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

৮.২ : সম্পদের মালিকানায় নারীর অবস্থান

সম্পত্তির মালিকানা ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড। প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে দেখা যায়, উত্তরদাতা নারীদের শতকরা ৭৩ জনেরই নিজের জমি নেই বা জমির মালিকানা নেই। মাত্র ২৭ জন নারী জমির মালিক। নারীর যেসব জিনিসকে তাদের সম্পত্তি হিসেবে মনে করে সেগুলো হলো– হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল, হাঁড়ি-পাতিল, কাঠের শোকেস, চেয়ার ইত্যাদি। অন্যদিকে অধিকাংশ উত্তরদাতার স্বামী পুরুষরাই জমির মালিক।

৮.২ : সম্পদের মালিকানায় নারীর অবস্থান

চলক	সংখ্যা	শতকরা হার
জমির মালিকানা		
হ্যাঁ	১২	২৭
না	৩২	৭৩
অন্যান্য মালিকানা		
কিছুই নেই	১৩	৩০
গবাদি পশু	২৯	৬৫
হাঁড়ি-পাতিল	২	৫
মোট	৪৪	১০০

সূত্র : নিজস্ব মাঠ গবেষণা

Dhaka University Institutional Repository

৮.৩ : গার্হস্থ্য কর্মে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ

গার্হস্থ্য কর্মে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ আমরা বুঝতে পারি নিম্নোক্ত ছক থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে। গবেষণায় দেখা যায়, গৃহব্যবস্থাপনার অধিকাংশ কাজ যেমন– রান্নাবান্না, শিশু লালন-পালন, ঘরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (ঘর লেপা), গবাদি পশুর দেখভাল করা ইত্যাদি কাজে নারীর অংশগ্রহণই বেশি। ৭ ভাগ পুরুষ সদস্যকে গৃহব্যবস্থাপনার কাজ যেমন ঘর তোলা ও গবাদিপশু পালনে পাওয়া যায়। তবে রান্না এবং শিশুপালনের দায়িত্বে পরিবারের একজন পুরুষ সদস্যকেও পাওয়া যায়নি। কিন্তু বাজার করার কাজটি পুরুষ সদস্য– ছেলে, স্বামী, শ্বশুর পালন করেন। আবার বাড়িতে রান্নার মেন্যু নির্ধারণ করা হয় পরিবারের পুরুষ সদস্যের পছন্দকে প্রাধান্য দিয়ে।

৮.৩ : গার্হস্থ্য কর্মে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ

কাজের ধরন	সংখ্যা	শতকরা হার
রান্নার দায়িত্ব পালনকারী		
নিজে	৩২	৭৩
নিজে এবং কন্যা	৪	৯
নিজে এবং ছেলের বউ	৮	১৮
শিশু লালন-পালনের দায়িত্ব		
নিজে	৩০	৬৭
নিজে এবং কন্যা	৬	১৪
নিজে এবং ছেলের বউ	৮	১৯
গৃহ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব		
নিজে	২৫	৫৭
স্বামী	৩	৭
দুজনে	৬	১৪
নিজে এবং মা	২	৫
নিজে এবং কন্যা	৩	৭
নিজে এবং ছেলের বউ	৫	১০
অবসরের কাজ		
বেড়ানো	৫	১১
ঘরের ভেতর আড্ডা	১৪	৩২
আড্ডা এবং হস্তশিল্প	১৫	৩৪
গৃহস্থালী কাজ	৩	৭
গবাদি পশুপালন	৩	৭
রেডিও শোনা, টিভি দেখা	৪	৯
অবসরে স্বামীর কাজ		
বেড়ানো	৯	২১
ঘরের বাইরে আড্ডা	১৯	৪৬
রেডিও শোনা, টিভি-সিনেমা দেখা	১৪	৩৩
বাজার করার দায়িত্ব		
নিজে	১	২
স্বামী	৩৩	৭৪
ছেলে	৬	১৪
স্বামী ও ছেলে	২	৫
অন্যান্য	২	৫
খাবারের মেন্যু পছন্দ করা		
নিজে	১৯	৪৩
স্বামী	২১	৪৮
ছেলে	৩	৭
মা	১	২

সূত্র : নিজস্ব মাঠ গবেষণা

অন্যদিকে অবসরে পরিবারের নারী সদস্যদের দেখা যায়, ঘরের ভেতর গল্প করে, পাটি বুনে, কাঁথা সেলাই করে, গরু-ছাগল পুষে সময় কাটাতে। আর পুরুষ সদস্য অবসরে এলাকার মোড়ের দোকানে চা খেতে খেতে আড্ডা দেন। প্রায়ই হাটের দোকানে আড্ডা দেন, টিভি-রেডিও ও সিনেমা দেখে সময় কাটান।

Dhaka University Institutional Repository

৮.৪ : সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী-পুরুষের ভূমিকা

ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতা অধিকাংশই নারী। তারাই বিভিন্ন পর্যায়ের ঋণ তুলে থাকেন। কিন্তু এই ঋণ ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত তারা নয় বরং তাদের স্বামীরা গ্রহণ করেন। স্বামীরা কিস্তি পরিশোধ করেন, আয়-রোজগার করেন কোনো কারণে সেটা সম্ভব না হলে গৃহস্থালি জিনিসপত্র, হাঁস-মুরগি ইত্যাদি বিক্রি করে কিস্তি পরিশোধ করেন নারীরা। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, মাত্র ৯ ভাগ নারী নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ঋণ কোন খাতে ব্যবহার করবেন সে বিষয়ে এবং সেসব নারীরাই সিদ্ধান্ত নেন যাদের স্বামী নেই, তালাকপ্রাপ্ত অথবা স্বামী বেকার বা অক্ষম।

৮.৪.১
ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবহারকারী

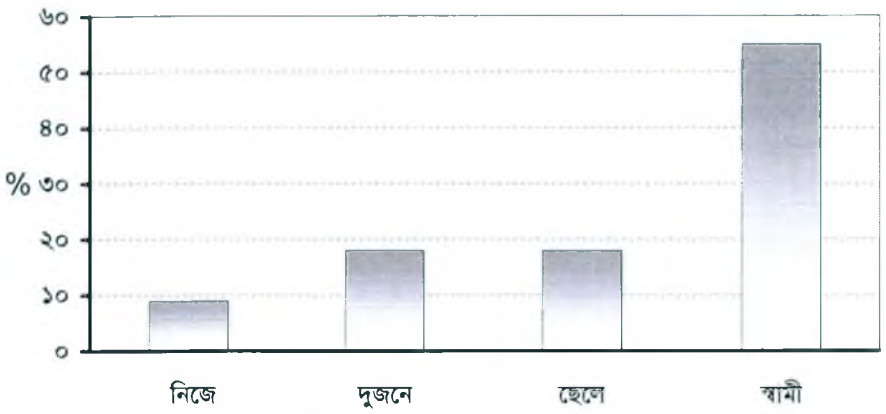

সূত্র : নিজস্ব মাঠ গবেষণা

ঋণ ব্যবহারকারী অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীরা নয়। এই বিষয়টিকে ক্ষমতায়ন ও নারী-পুরুষ সম্পর্কের পরিবর্তনের জায়গা থেকে বেশি গুরুত্ব দেয়া দরকার। আর্থিক এবং পারিবারিক অন্যান্য সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন মাত্র ১৮ ভাগ নারী। উভয়েই মিলে সিদ্ধান্ত নেন ৩২ ভাগ নারী। আর স্বামী, ছেলে সিদ্ধান্ত নেন ৪৮ ভাগ। সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরিবারের পুরুষ সদস্যরাই বেশি গুরুত্ব পায়। যে পরিবারে স্ত্রী আয় করেন, স্বামী বেকার বা অসুস্থ

৮.৪.২
আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী

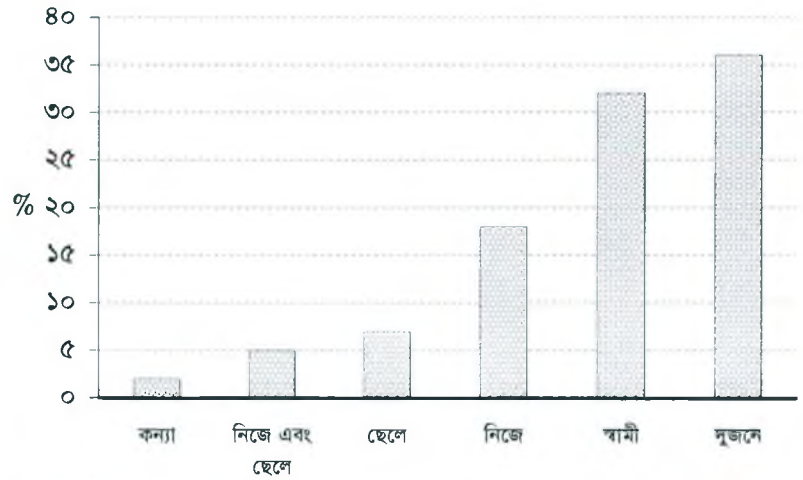

সূত্র : নিজস্ব মাঠ গবেষণা

সেখানেই কেবল স্ত্রীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্ত্রী আয় করলেও খরচের হিসাব বা সিদ্ধান্ত স্বামী নিয়ে থাকেন। পারিবারিক কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত পুরুষ সদস্যরাই নেন। আর অতিদরিদ্র পরিবারে লক্ষ্য করা যায়, স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৮.৫ : নিজের শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ

বাংলাদেশে গ্রামীণ দরিদ্র নারীরা, যারা ব্র্যাকসহ অন্যান্য এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণ করেন, তাদের বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিকারী কাজের সাথে যুক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা এখন দরিদ্র নারীদের দৌরগোড়া পর্যন্ত পৌছেছে। পরিবার পরিকল্পনা কে গ্রহণ করেছেন এ তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা যায়, নারীরাই বেশি গ্রহণ করছেন। এর হার প্রায় ৯৪ ভাগ।

৮.৫ : নারী-পুরুষের পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ

চলক	সংখ্যা	শতকরা হার
পদ্ধতির ব্যবহার		
হ্যাঁ	৩৩	৭৫
না	৮	১৮
অবিবাহিত/তালাকপ্রাপ্ত ও অন্যান্য	৩	৭
পদ্ধতি গ্রহণকারী		
নিজে	৩১	৯৪
স্বামী	২	৬
বিভিন্ন পদ্ধতি		
পিল	১০	৩০
নরপ্ল্যান্ট	৫	১৫
লাইগেশন (নারী)	১০	৩০
ইঞ্জেকশন	৬	১৮
কনডম/অপারেশন (পুরুষ)	২	৬

** মোট ৪৪ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৩৩ জন বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করে*
সূত্র : নিজস্ব মাঠ গবেষণা

নারীরা নিজের ইচ্ছায় পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন এরকম দৃষ্টান্ত নেই বললেই চলে। বরং স্বামীর সিদ্ধান্তেই পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তারা। তাদের ধারণা, যা তাদের স্বামীরাই নির্মাণ করেছেন, স্বামীরা বাইরে কাজ করার ফলে তারা যদি জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি গ্রহণ করেন তাহলে তাদের স্বাস্থ্যের হানি ঘটবে। ফলে নারীকেই পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। নারীদের স্বাস্থ্যহানির প্রশ্নটি উত্তরদাতাদের কারো মধ্যেই উঠতে দেখা যায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

৮.৬ : সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা প্রসঙ্গ

ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে ব্র্যাক সচেতনতামূলক ১৮টি প্রতিজ্ঞা পাঠ করায় প্রত্যেক সপ্তাহে। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়ে সচেতন করার চেষ্টায় থাকে। তার ফলে দেখা যায়, বর্তমানে উত্তরদাতাদের ৮২ ভাগ মেম্বারের নাম জানেন, ৫২ ভাগ চেয়ারম্যানের নাম জানেন, প্রধানমন্ত্রীর নাম জানেন ৫০ ভাগ। বাকি ৫০ ভাগ প্রধানমন্ত্রীর নাম জানেন না। মেম্বার, চেয়ারম্যানদের নাম অধিকমাত্রায় জানার ক্ষেত্রে তাদের সাথে যোগাযোগ, দূরত্ব কম থাকা, এলাকার মধ্যে থাকার বিষয়টি গুরুত্ব পায়। আর প্রধানমন্ত্রীর নাম যারা জানে না তারা রেডিও বা টিভি দেখার সুযোগ পান না। যাদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত দীন, কোনোমতে বেঁচে আছেন, থেকে বাইরের আলাপ-আলোচনা যাদের কান পর্যন্ত পৌঁছায় না সেসব পরিবারের নারীরা প্রধানমন্ত্রীর নাম জানেন না।

৮.৬.১ : সামাজিক-রাজনৈতিক সচেতনতায় নারী-পুরুষের অবস্থা

চলক	সংখ্যা	শতকরা হার
রাজনৈতিক সচেতনতা		
মেম্বারের নাম জানেন	৩৬	৮২
চেয়ারম্যানের নাম জানেন	২৩	৫২
প্রধানমন্ত্রীর নাম জানেন	২২	৫০
অন্যায়/দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী	৩	৭
আইনগত সচেতনতা		
বিবাহ আইন সম্পর্কে জানেন	১৬	৩৬
তালাক আইন সম্পর্কে জানেন	৮	১৮
উত্তরাধিকার আইন জানেন	২৪	৫৫
নারী-পুরুষের সমান উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে		
হ্যাঁ	২২	৫০
না	১৭	৩৯
মন্তব্য নেই	৫	১১
পর্দার ব্যবহার		
হ্যাঁ	১৬	৩৬
না	৮	১৮
মধ্যম	২০	৪৫

** মোট উত্তরদাতা ৪৪ জন*
সূত্র : নিজস্ব মাঠ গবেষণা

বিয়ে, রেজিস্ট্রেশন, বিয়ের বয়স, বাল্যবিবাহ, তালাক ইত্যাদি প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা অত্যন্ত কম। বর্তমানে ৩৬ ভাগ বিয়ে রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কে জানেন এনজিও প্রচারণা ও প্রচার মাধ্যমের কারণে। তালাকপ্রাপ্ত নারী ছাড়া অধিকাংশই তালাক কীভাবে হয় এ সম্পর্কে ধারণা রাখেন না। বাল্যবিবাহের ক্ষতির দিক সম্পর্কে সরকার, এনজিও প্রচার মাধ্যমের কারণে তারা জানতে পারে। কিন্তু তার প্রভাব খুব বড় মাত্রায় তাদের জীবনে নেই।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরাধিকার সম্পর্কে প্রায় অর্ধেকেরও বেশি নারী সচেতন আছেন। পারিবারিক সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা প্রতিনিয়ত দেখতে পান বলে এ বিষয় সম্পর্কে তারা ওয়াকেফাল। অধিকাংশ নারীই মনে করেন, ছেলে-মেয়ে উভয় সন্তানের সমান সম্পত্তি পাওয়া দরকার; কিন্তু আইন করা আছে ছেলেরা বেশি পাবে তাই করার কিছু নেই।

৮.৬.২ : মেয়ের বিয়ের যৌতুক

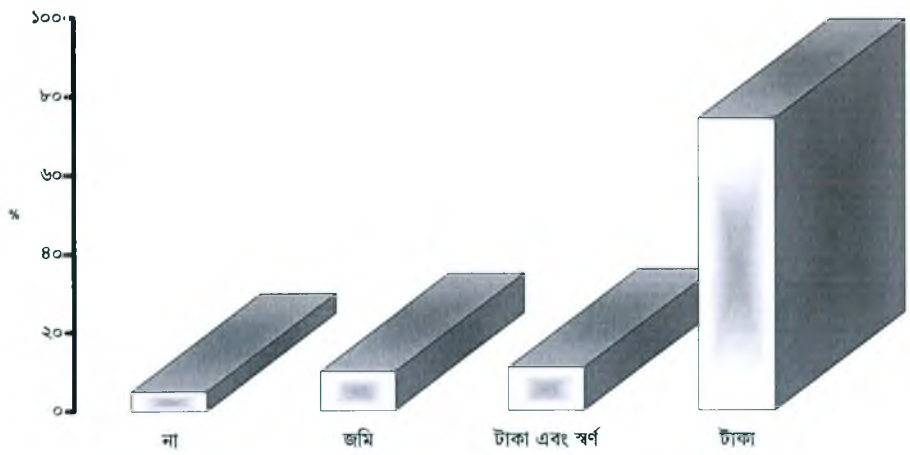

সূত্র : নিজস্ব মাঠ গবেষণা

পর্দা প্রথা সম্পর্কে জানতে চাইলে ৪৫ ভাগই জানান, 'শালীনতা'র মধ্যে মেয়েদের থাকা দরকার। ৩৬ ভাগ পর্দা থাকা দরকার বলে জানান।

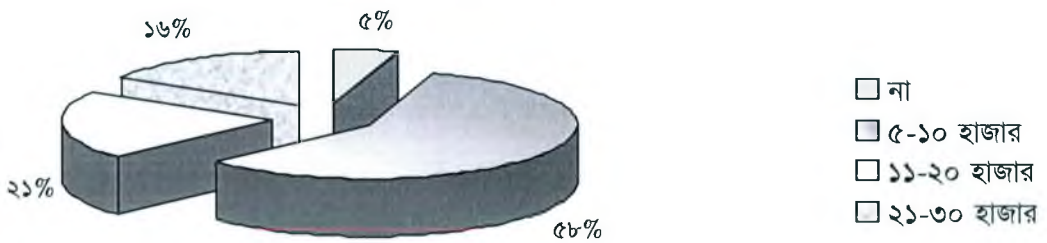

সূত্র : নিজস্ব মাঠ গবেষণা

যৌতুক প্রথা নারী-পুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে নারীর দিক থেকে অধঃস্তনতার অবস্থাকে আরো প্রকটভাবে সামনে আনে। তাই বর্তমানে দেশে যৌতুক প্রথা কোন মাত্রায় কার্যকর আছে সে বিষয়টি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। দেখা যায়, অধিকাংশেরই নিজের বিয়ের সময় বাপের বাড়ি থেকে স্বামী একটা মোটা অংকের অর্থ পেয়েছেন। আবার ছেলেকে বিয়ে দেবার সময় টাকা-স্বর্ণ লেনদেন করেছেন। অন্যদিকে মেয়ের বিয়ের জন্য যে কোনো উপায়ে টাকা জমিয়ে মেয়ের জামাইকে দিয়েছেন। ৯৫ ভাগই মেয়ের জামাইকে ৫ হাজার, ১০ হাজার থেকে ৩০ হাজার করে টাকা দিয়েছেন। এ টাকা দেয়াকে প্রত্যেকে স্বাভাবিক হিসেবে দেখেন। ব্র্যাক সচেতনতামূলক ১৮টি প্রতিজ্ঞায় যৌতুক লেনদেন অপরাধ সম্পর্কে সচেতনতা প্রদান করা হলেও এর প্রয়োগ বাস্তবে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারেনি।

Dhaka University Institutional Repository

৮.৭ : আত্মনির্ভরশীলতা প্রসঙ্গ

ঋণগ্রহীতাদের ঋণ গ্রহণের পরে স্বাবলম্বী হয়েছেন কিনা বা অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা দূর হয়েছে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় শতকরা ৪৩ জন বলেছেন, অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। শতকরা ২৫ জন বলেন, কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। এখনো অন্যের কাছে ধার করতে হয়, কিস্তির ওপর নির্ভর করতে হয়।

৮.৭ : আত্মনির্ভরশীলতা প্রসঙ্গ

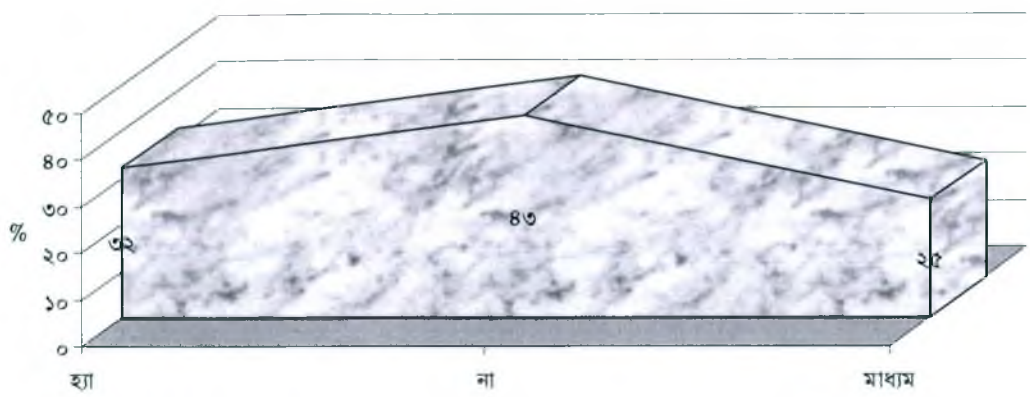

সূত্র : নিজস্ব মাঠ গবেষণা

Dhaka University Institutional Repository

৮.৮ : অতিদরিদ্র কর্মসূচির সুবিধাভোগী নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

অতিদরিদ্র কর্মসূচির আওতাধীন ২০ জন নারীর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সারণি দেয়া হলো।

৮.৮ : অতিদরিদ্র কর্মসূচির সুবিধাভোগী নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

বয়স	সংখ্যা	শতকরা হার
১৮-২৫	৪	১০
২৫-৩৫	১১	৫৫
৩৫-৪০	৫	২৫
বৈবাহিক অবস্থা		
বিবাহিত	৯০	১৮
অবিবাহিত	০	০
তালাকপ্রাপ্ত	১০	২
স্বামীর পেশা		
কৃষি	১০	৫৬
ড্রাইভার	২	১১
শ্রমিক	৫	২৮
অক্ষম বেকার	৩	৬

** মোট উত্তরদাতা ২০ জন*
সূত্র : নিজস্ব মাঠ গবেষণা

২০ জন নারীর প্রত্যেকের বয়স ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। এরা কেউ অন্যের বাড়িতে কাজ করে, কেউ ভিক্ষা করে অথবা অতিদরিদ্র শ্রেণীতে পড়ার জন্য যে বৈশিষ্ট্য ব্র্যাক নির্ধারণ করেছে তার মধ্যে পড়েন। নারীর কাজের ক্ষেত্র বর্তমানে ব্র্যাকের অনুদান গ্রহণ করে রয়েছে বেশির ভাগের গবাদিপশু পালন। এছাড়া আছে নার্সারি, ননফার্মের মধ্যে জুতার কারখানায় কাজ। ব্যবসার মধ্যে শাড়ি, ব্লাউজ, ফিতা ইত্যাদি। অন্যদিকে স্বামীরা কৃষি, ড্রাইভার, শ্রমিক ইত্যাদি কাজে যুক্ত আছেন। নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে প্রায় ২০ জনই নিরক্ষর।

Dhaka University Institutional Repository

৮.৯ : সম্পদের মালিকানায় নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ

অধিকাংশ অতিদরিদ্র সদস্যদের নিজেদের কোনো জমি নেই। অন্যের বাড়িতে বা খাস জমিতে তাদের বাস। যে ৫ জনের জমি আছে তার মধ্যে পুরুষ ৩ জন জমির মালিক।

৮.৯ : সম্পদের মালিকানায় নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ

	সংখ্যা	শতকরা হার
জমির পরিমাণ		
জমি নাই	১০	৫০
খাস জমি	৫	২৫
১ থেকে ৫ শতাংশ	৫	২৫
জমির মালিক		
স্ত্রী/নিজ	২	৪০
স্বামী	৩	৬০

** মোট উত্তরদাতা ২০ জন*

সূত্র : নিজস্ব মাঠ গবেষণা

Dhaka University Institutional Repository

৮.১০ : অতিদরিদ্র কর্মসূচিতে সুবিধাভোগীদের অবস্থান পরিবর্তনের চিত্র

অতিদরিদ্র অবস্থার উন্নতি পরিবর্তনে দারিদ্র্য দূরীকরণের বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা যায়– আগে একবেলা খাদ্য গ্রহণ, এখন দুই/তিন বেলা খাদ্যের সুযোগ; শাড়ি ১টার পরিবর্তে এখন ৩/৪টা; গরু-ছাগল নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে থাকা ইত্যাদি। অতিদরিদ্র কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা বাংলাদেশের অতিদরিদ্র ৩০ ভাগের মধ্যে পড়েন। এদের নিজেদের জমিজমা নেই, গড়ে ১৮০০ ক্যালোরির ওপর খাদ্য গ্রহণ করেন না। নারী-পুরুষ উভয়ই সমান আর্থিক সংকটের মধ্যে থাকেন। ফলে পরিবারের নারী সদস্যদের মাধ্যমে টিকে থাকার সামান্য ব্যবস্থায় তাদের আচরণেরও পরিবর্তন ঘটে। যে পরিবর্তনের কারণে বাড়ির মেয়ে বা স্ত্রীকে আগে যে পরিমাণ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হতো, তা পরিমাণে কম হতে দেখা যায়। তার পরিবারের কর্তার জায়গায় পুরুষ কিন্তু ঠিকই অবস্থান করে এবং নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিও প্রায় অটুট থাকে।

৮.১০ : অতিদরিদ্র কর্মসূচিতে সুবিধাভোগীদের অবস্থান পরিবর্তনের চিত্র

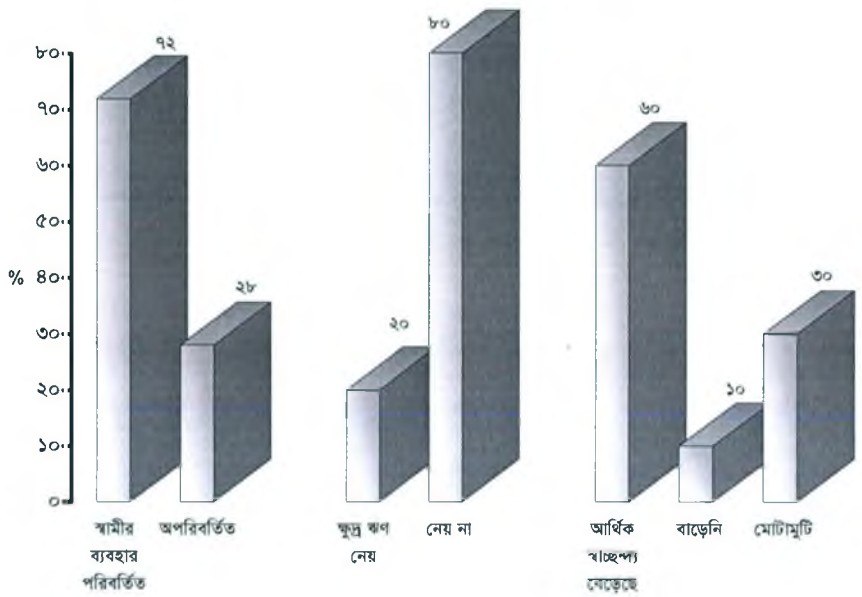

** মোট উত্তরদাতা ২০ জন*
সূত্র : নিজস্ব মাঠ গবেষণা

Dhaka University Institutional Repository

অ | ষ্ট | ম | অ | ধ্যা | য়

নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী-পুরুষ সম্পর্কের সামগ্রিক পর্যালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী-পুরুষ সম্পর্কের সামগ্রিক পর্যালোচনা

নারীর ক্ষমতায়ন, উন্নয়ন, বৈষম্য দূর ইত্যাদি প্রসঙ্গের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের বিদ্যমান বাস্তবতায় এনজিও কার্যক্রমের বিষয়টি অনিবার্যভাবেই গুরুত্ব পায়। এই গুরুত্ব পাবার পেছনে দেশজুড়ে বিস্তৃত পরিধিতে বিশেষভাবে দরিদ্র নারীদের মধ্যে এনজিওর কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি কাজ করে। বর্তমানে এ দেশের গ্রামাঞ্চলে নারীদের মধ্যে নানা কর্মসূচি নিয়ে হাজির হয়েছে এনজিও। নারী বিষয়কে কেন এসব প্রতিষ্ঠান সামনে আনছে এ বিষয়ে আগেই প্রশাসনিক কার্যক্রমে নারীর অবস্থান আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। গবেষণায় এই বিষয়টির ওপর গুরুত্বারোপ করে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে নারীর ক্ষমতায়নের চিত্র। এনজিওত্রয়ের কর্মসূচিতে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে নারীর ক্ষমতায়ন কতদূর অগ্রসর হয়েছে সেই পর্যালোচনাই এ অধ্যায়ে করা হবে।

এই পর্যালোচনায় ঢোকার আগে নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে আলোচনা জরুরি। শুধু এনজিও নয় 'নারী' বিষয়ে যারা গবেষণা করছেন তাদের এ বিষয়ে বিশ্লেষণ বা সূচক নির্ধারণের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। এনজিওর দলিল, তাদের প্রতিনিধি বা বিভিন্ন ব্যক্তি ও গবেষকদের বক্তব্যে আমরা ক্ষমতায়নের নির্দিষ্ট কিছু সূচক নির্ধারণ প্রবণতা লক্ষ্য করি। একেক জায়গা থেকে একেকভাবে এই সূচক নির্ধারণ করা হয়। নিচে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানের এ বিষয়ে মতামত থেকে পর্যালোচনা দাঁড় করা হলো।

বশির আহমেদ (২০০২) তাঁর লেখায় নারীর ক্ষমতায়নের বিষয় উল্লেখ করেন, নারীর সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার, বাজার অর্থনীতিতে ঢোকার সমান সুযোগ এবং পরিবার ও সমাজে নারী-পুরুষের বৈষম্যহীন ক্ষমতা সম্পর্ক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে নারীর অধীনস্থতা দূর হওয়ার সম্পর্ক নিবিড়।

মেঘনা গুহ ঠাকুরতা ও সুরাইয়া বেগম (১৯৯৫) তাঁদের এক গবেষণাধর্মী লেখায় নারীর ক্ষমতায়ন বলতে যে বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলো হলো : নারীর নিজস্ব ক্ষমতা বৃদ্ধি, জীবনযাত্রায় সম্ভাব্য বিকল্প গ্রহণ করতে পারা, উৎপাদন ও সম্পদের অংশীদারিত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ।

অন্যদিকে শামীমা পারভীন কি প্রক্রিয়ায় ক্ষমতায়ন হতে পারে সে বিষয়ে বলতে গিয়ে দেখিয়েছেন : ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় নারী বস্তুগত ও মানবিক সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করবে; মতাদর্শিক ক্ষেত্রে ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। নারীর শক্তি, জ্ঞান, দক্ষতাকে স্বীকৃতি দিতে হবে; নারীদের সংগঠন গড়তে হবে; নারীর অবস্থা নয় অবস্থানের পরিবর্তন ঘটাতে হবে; ব্যক্তিপর্যায়ে নয় সামষ্টিক পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন আনতে হবে; গৃহস্থালি কাজ থেকে মুক্ত হতে হবে। এছাড়া রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বৈষম্যমূলক আইন পরিবর্তনের কথা তিনি উল্লেখ করেন।

আবার আনু মুহাম্মদ (১৯৯৭) এক গ্রন্থে বলেন, 'নারীর মুক্তির যে কর্মসূচি তাতে সকল নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান বা বাঁচার মতো মজুরি যখন অধিক গুরুত্ব পায়, যখন পুরুষতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা, আইন পরিবর্তন কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়, মালিকানা প্রশ্ন এবং নারী-নারী ও নারী-পুরুষ সমতা প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হয়, পরিবারে ও বাইরে নারীর ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের তাগিদ কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকে তখন নারী আন্দোলন বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না, তা সম্পর্কিত হয়ে যায় কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র তথা পরিবেশ এবং সর্বোপরি মুক্তসমাজ

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সঙ্গে। ... কিন্তু এই আন্দোলনের বিকাশ ভিন্ন নারী আন্দোলনেরও দুষ্টবৃত্ত মুক্ত হবার রাস্তা নেই। বাংলাদেশে পুরুষতন্ত্র প্রভাবিত, শ্রেণী প্রশ্ন সম্পর্কে অস্বচ্ছ দুর্বল রাজনৈতিক আন্দোলন এবং রাজনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র সম্পর্কে নির্লিপ্ত নারী আন্দোলনের বড় ধরনের পরিবর্তন এখন অপরিহার্য। অপরিহার্য এর জন্য প্রয়োজনীয় মতাদর্শিক-সাংগঠনিক প্রস্তুতি নির্মাণ।'

ব্র্যাক তার টেকনিক্যাল ম্যানুয়েল-এ নারীর ক্ষমতায়ন বলতে উল্লেখ করছে– অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরশীলতা, আয়, অর্থ নিয়ন্ত্রণ, পরিবার ও সমাজে অধিকার সচেতনতা, শরীর-সময়-চলাফেরার ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ, সম্পদের ব্যবহারে সমান অংশগ্রহণ এবং সংগঠনে উভয়ের মতামত গ্রহণ; কিন্তু অন্যদিকে তার জেন্ডার পলিসিতে এমন কিছু দিক তুলছে যাতে নারীকে কেবল পরিবারের সদস্য, গার্হস্থ্য অর্থনীতির ব্যবস্থাপক, সন্তান পালনকারী হিসেবে পাওয়া যায়। ঐ পলিসিতে উল্লেখ করা হয়–

'ব্র্যাক মনে করে নারীরাই সমাজের ও পরিবারের পরিবর্তনের হাতিয়ার। দুনিয়াব্যাপী এটা স্বীকৃত যে, একটি পরিবারের ভালো থাকার জন্য গার্হস্থ্য অর্থনীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যার অংশ হচ্ছে খাদ্যের নিশ্চয়তা, সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং শিশু পালন। আর এ কাজে নারীদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। ব্র্যাক এই অবস্থাকে বিবেচনা করেই নারীকে মূল্যায়ন করে।' ব্র্যাক তার আদর্শিক জায়গায় নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নটিকে বিভিন্নভাবে হাজির করেছে। এক জায়গায় বলেছে, নারীর সকল কাজে সমান অংশগ্রহণের কথা অথচ অন্য জায়গায় নারীকে কেবল গৃহস্থালি কাজের ব্যবস্থাপক এবং শিশু পালনকারী হিসেবে প্রধান ভূমিকায় চিহ্নিত করে নারীকে সীমায়িত করেছে।

প্রশিকা এ বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে তার জেন্ডার পলিসিতে উল্লেখ করে, সংস্থার সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সম্পর্কের সমতা নিশ্চিত করা; সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ, সমঅধিকার, সমসুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা; ঐতিহাসিকভাবে সৃষ্ট নারীর সামাজিক পশ্চাৎপদতা, বঞ্চনা এবং তাদের বিশেষ চাহিদাসমূহ বিবেচনা করে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা; নারীর অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তনের অনুকূল শর্ত ও পরিবেশ তৈরি করা; জেন্ডার উন্নয়ন প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।

এর পাশাপাশি বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধিরাও নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে তাদের মতামত প্রকাশ করেন। প্রশিকার কর্মকর্তা রফিকা আক্তার হাসি বলেন, "ধর্মীয় এবং সরকারিভাবে নারী বৈষম্যের শিকার। সম্পদের বণ্টনের নিয়মের কারণে পরিবারে মেয়েরা আন্ডারমাইন্ড এবং মেয়ে হিসেবেই চিহ্নিত। জাতীয় পর্যায়ে নারী-পুরুষ সমান এ কথা বলা হয়, কিন্তু আসলে সেটা নেই। যদি থাকতো তাহলে সম্পদের মালিকানার একটি নির্দিষ্ট নীতি তৈরি করা হতো। যেখানে ছেলেমেয়ে সমান অধিকার পাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সম্পদের সমান অধিকার আসবে ততদিন পর্যন্ত মেয়েদের অধঃস্তন থাকতে হবে। ওখানেই মেয়েদের বৈষম্যটা বড়। সরকারের এ বিষয়ে আগ্রহের দৌড় বোঝা যায় সিডো সনদের দিকে তাকালে। এই সনদে বাংলাদেশ সরকার সম্পদের সমান মালিকানার জায়গায় স্বাক্ষর করেনি। যুক্তি হিসেবে দেখিয়েছে, এতে ধর্মকে অবমাননা করা হয়। মালিকানার প্রশ্নটা রাষ্ট্রনীতির সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু আমাদের সরকার এই স্পর্শকাতর জায়গাকে ধরতে পারছে না। কারণ এটা করতে গেলেই মাওলানারা চিৎকার করে উঠবে, আমাদের ধর্ম নষ্ট করা ফেলা হয়েছে।"

এক সাক্ষাৎকারে এ প্রসঙ্গে ব্র্যাকের আফসান চৌধুরী বলেন, "ক্ষমতাহীনতার পরিমাপটা আগে করা দরকার। তারপর দেখা দরকার মেয়েরা কেন ক্ষমতা হারায়। গড্ডালিকা প্রবাহের মতো কেবল ক্ষমতায়ন-ক্ষমতায়ন বলে লাভ নেই। বিষয়টা কি সেটার বিশ্লেষণ খুবই কম। যার ফলে মেয়েদের ক্ষমতায়ন বলতে বোঝানো হয়– নারীর আয়, তার স্বামীর সাথে সম্পর্কের উন্নতি-সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাচ্চার লালন-পালনে অংশগ্রহণ ইত্যাদিকে। অনেক সময় আমরাই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিচ্ছি, এটাই এমম্পাওয়ারমেন্ট। নারীর সাথে কথা বলে যদি দেখা যায়, সে এমন কিছু উত্তর দিচ্ছে, যা পশ্চিমা উন্নয়ন মডেলের সাথে মেলে না তখন কি করা যাবে– আমরা জানি না। তাহলে আমাদের নিজেদের অবস্থানটাই তো ভুল হয়ে পড়বে। ক্ষমতায়ন সে কারণেই আমি মনে করি, খুবই ধোঁয়াটে একটা জায়গা। তবে যদি ৩০-৩৫ বছর আগের কিংবা এখনকার অবস্থা দেখি তাহলে দেখবো মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে। আজকে অন্তত কিছুসংখ্যক মানুষ প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানে দাঁড়িয়ে গেছে আত্মসম্মানে। আমার মনে হয়, 'আত্মসম্মান'টাই সবচেয়ে বড় ক্ষমতায়ন। যে অবস্থাই হোক না কেন, ব্যক্তি নিজেকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে পারে– এটা নিশ্চয়ই হয়েছে। কিছুসংখ্যক পুরুষ অন্তত মানতে শিখেছে তারই লাভ হবে যদি সে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টা বোঝে এবং সহকর্মী হিসেবে একটা মেয়েকে গ্রহণ করতে পারে।"

Dhaka University Institutional Repository

শিফা হাফিজা নারী ক্ষমতায়নের সূচকগুলোর পাশাপাশি সামগ্রিকতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, "এম্পাওয়ারমেন্ট সবসময় বৃহত্তর ব্যাপার। যেমন ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্য– এটা হচ্ছে ক্ষমতায়নের অংশ, একটা বড় অর্জন। যাতে এনজিওর ভূমিকা আছে। কিন্তু এ অর্জনকে আমরা ধরে রাখতে পারি না। তার কারণ– রাজনৈতিক ও সামাজিক।"

পারভীন মুশতারী এ বিষয়ের সূচক হিসেবে শিক্ষার অনুপাত সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে নারীর সমান অংশগ্রহণ, উচ্চপর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

নাগরিক উদ্যোগের জাকির হোসেন ক্ষমতায়নের সূচক হিসেবে উল্লেখ করেন–ক্ষুদ্রঋণের বিষয় যা নারীর ক্ষমতায়নে ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া নারীদের কথাবার্তা বৃদ্ধি পাওয়া, বেড়াতে বের হওয়া, দৃশ্যমান গতিশীলতা, সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হওয়া এসবকে তিনি সূচক হিসেবে চিহ্নিত করেন।

নারীর ক্ষমতায়নের চিত্র

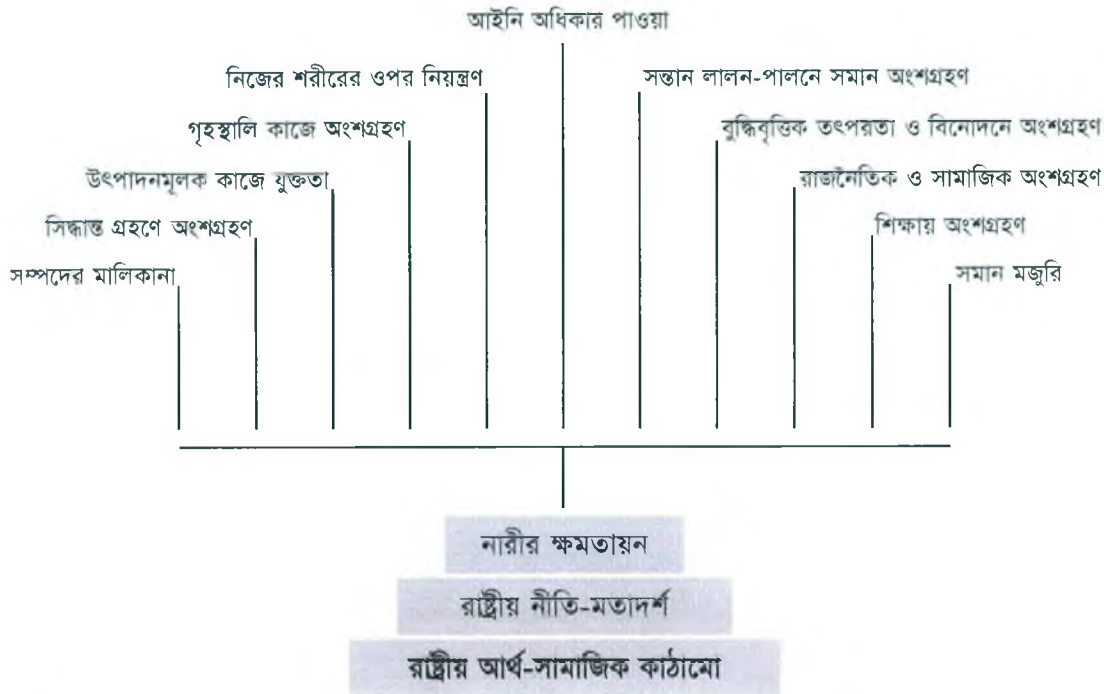

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় নারী-পুরুষ সম্পর্কের সমতা প্রসঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ক্ষমতায়নের চিত্র অঙ্কন করেছে। বশির আহমেদ ও শামীমা পারভীন ও আনু মুহাম্মদের বক্তব্যে এ বিষয়ে সামগ্রিক কিছু নির্দেশনা মেলে। অন্যদিকে এনজিওত্রয়ের দলিলপত্র এবং প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এ বিষয়ে ধারণাগত অস্পষ্টতা বা খণ্ডিত রূপ রয়েছে। নির্দিষ্ট সূচক বাস্তবায়িত কীভাবে হবে, এই প্রক্রিয়ায় উদ্যোগগুলোর জন্য সামগ্রিক আয়োজন কী এই জায়গাগুলো পরিষ্কার নয় বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অনুপস্থিত। কেউ কেউ সামগ্রিক পরিবর্তনের জন্য রাষ্ট্রের ভূমিকার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন ঠিকই। কিন্তু এটি ব্যক্তিপর্যায়ে যতটা দেখা যায় সাংগঠনিক জায়গায় ততটা নেই।

বিভিন্ন ব্যক্তি ও এনজিও দ্বারা নির্ধারিত সূচক বৈশিষ্ট্যের আলোকে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়ক শর্ত হিসেবে যেসব বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা দরকার তা হলো– ক. সম্পদের মালিকানা খ. সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমান অংশগ্রহণ গ. উৎপাদনমূলক/অর্থনৈতিক কাজে যুক্ততা/আত্মনির্ভরশীলতা ঘ. গৃহস্থালি কাজে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ ঙ. নিজের শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকা চ. আইনি অধিকার সমান পাওয়া ছ. সন্তান লালন-পালনে অংশগ্রহণ জ. বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতা ও বিনোদনে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ ঝ. রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতায় সমান অংশগ্রহণ ঞ. শিক্ষায় নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ ও ট. মজুরি প্রসঙ্গে। সর্বোপরি রাষ্ট্রকাঠামো ও অর্থনীতির রূপরেখা, যার ওপর ভিত্তি করে সূচক বাস্তবায়িত হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত সবগুলো শর্ত সমানভাবে না থাকলে নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে বা নারী-পুরুষ সম্পর্কের সমতা তৈরি হয়েছে তা বলা যাবে না। জমি বা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা যদি একজন নারীর থাকে কিন্তু অর্থ ব্যয় খরচ বা ওপর যদি তার নিয়ন্ত্রণ না থাকে তবে কী আমরা তাকে ক্ষমতায়ন হয়েছে বলতে পারি। নিশ্চয়ই পারি না। একজন ক্ষমতায়িত নারী, যার সম্পদের মালিকানা এবং অর্থ খরচের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অবস্থা আছে সে যদি গৃহস্থালি সকল কাজ একলা করে, সকল ঘানি একলা টানে, রান্নাবান্না করে, সন্তান লালন-পালন করে, স্বাস্থ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে তাকেও আমরা ক্ষমতায়ন বলতে পারবো না। অর্থাৎ নারীর ক্ষমতায়ন আমরা তখনই হয়েছে বলতে পারি, যখন উপরোক্ত সমস্ত বিষয়গুলো পূরণ হতে পারে সকল নারীর জন্য। মূলত ক্ষমতায়ন কোনো ব্যক্তি পর্যায়ের উন্নয়নের বিষয় নয়। এর পরিধি সামষ্টিক এবং সামগ্রিকতায় ব্যাপ্ত। আর সামগ্রিক দিক বিচার করলে ক্ষমতায়নের জন্য নির্ধারিত সূচক বাস্তবায়ন হতে পারে রাষ্ট্রীয় নীতির মধ্যে পরিবর্তনের মাধ্যমে। যে বিষয়টি সবসময় এনজিও মহলে অনালোচিত থাকে।

এ পর্বে সংস্থাত্রয়ের কর্মসূচির অংশগ্রহণকারী এবং দলিলপত্র থেকে ক্ষমতায়নের যে বৈশিষ্ট্যগুলো উপরে উল্লেখ করা হলো। সেগুলোর আলোকে কর্মসূচি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ফলাফলের ভিত্তিতে নিচে পর্যালোচনা করা হলো।

এনজিওর কার্যক্রমে (ক্ষুদ্র ঋণ, শিক্ষা, আইনি সহায়তা) দেখা যায়, নারীদের অংশগ্রহণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে এ দেশের দরিদ্র গ্রামীণ নারীদের শ্রম যেভাবে বাজারের সাথে সম্পৃক্ত না হয়ে স্থির ছিল, এখনকার অবস্থা তা নয় বরং দেশের প্রায় ১০ ভাগ এনজিওর ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির আওতায় যুক্ত হয়েছে। এই আওতায় আসা নারীদের অধিকাংশই নিম্ন আয় বা নিম্নবিত্ত শ্রেণীর সদস্য। এক্ষেত্রে পরিবারের নারী এবং পুরুষ সদস্য দুজনই সমান অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়লেও নারীদের অবস্থা বেশি জীর্ণ লক্ষ্য করা যায়। অতিদরিদ্র কর্মসূচির ৮.১.১/৮.১.২ ছকের দিকে নজর দিলে দেখা যাবে, নারীদের তুলনায় শিক্ষাগত অবস্থানে এগিয়ে আছে পুরুষরা। অর্থাৎ শিক্ষার সমান সুযোগের ক্ষেত্রে পুরুষরা সুবিধাপ্রাপ্ত। আবার পরিবারের শিশু সদস্যদের শিক্ষা দেখার মতো অবস্থাও তৈরি হয়নি। মুহাম্মদ ইউনূস (১৯৮২) বলেন, 'উপার্জনের টাকায় প্রথম সুবিধা ভোগ করেন নারীর সন্তানরা। পরিবারে ১ জন সন্তান অন্তত শিক্ষা পায়, স্কুলে যাবার সুযোগ পায়। তার কাপড়-চোপড় জোটে।' কিন্তু দেখা যায়, উত্তরদাতার সন্তানরা স্কুলে গেলে প্রাথমিক পর্যায়ে বড় অংশ ঝরে পড়ে। শিশু-কিশোর বয়সেই তারা কাজের সাথে যুক্ত হয়। মেয়ে শিশুরা স্কুল বাদ দিয়ে পরিবারে গার্হস্থ্য কর্মে অংশ নেয় অথবা কিছুদিনের মধ্যে বিয়ে হয়ে যায়। ছেলে শিশুরা কৃষি, দোকানদারি, শ্রমিক ইত্যাদি পেশায় যুক্ত হয়। শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রাথমিকভাবে মিললেও ধারাবাহিকতা রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে অধিকাংশের।

উত্তরদাতার পেশা হিসেবে দেখা যায়, অধিকাংশই যুক্ত সকল ধরনের গার্হস্থ্য কর্ম অথচ পুরুষের পেশা হিসেবে কৃষি, হকার, ক্ষুদ্র ব্যবসা, শ্রমিক ইত্যাদি পাওয়া। অর্থাৎ আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে নারী ও পুরুষের কাজ/পেশা হিসেবে প্রচলিত কাঠামোতে যেগুলো স্বীকৃত তার তেমন পরিবর্তন হয়নি।

উৎপাদনমূলক কাজে নারীর অংশগ্রহণ এখনো গ্রামপর্যায়ে বৃদ্ধি পায়নি। কৃষিকাজের মধ্যে ধান মাড়াই, বাছাই, সংগ্রহের কাজ নারীরা করেন; কিন্তু ধানসহ অন্যান্য ফসলের চাষ পুরুষরা করে আবার ট্রাক্টর, পানি সেচযন্ত্র এসব পরিচালনার কাজও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষ করছে। অর্থাৎ সম্পদ তৈরি হয় যে স্বীকৃত উৎপাদন প্রক্রিয়ায় তাতে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ নেই। এনজিও কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী অবস্থাও এক্ষেত্রে পরিবর্তিত নয়।

এনজিও কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে নারীর সামাজিক জীবনে তেমন পরিবর্তন ঘটেনি। কর্মসূচির তথ্য থেকে প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, কর্মসূচির অংশগ্রহণকারীদের নিজের নামে অধিকাংশের জমি-জমা নেই। জমি-জমা আছে পরিবারের পুরুষ সদস্য স্বামী, বাবা বা শ্বশুরের নামে। তালাকপ্রাপ্ত বা বিধবা নারী বা পরিবারের একমাত্র আয়কারী যেসব নারী তাদের কিছু সম্পত্তি থাকলেও তা সংখ্যায় কম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী আর পুরুষের চোখে সম্পত্তির ধারণা সমান নয়। নারীর কাছে গার্হস্থ্য উপাদান এবং গবাদিপশু (হাঁড়ি-পাতিল, হাঁস-মুরগি, গরু) যেমন সম্পদ হিসেবে পরিচিত, পুরুষের কাছে ওইগুলো সম্পত্তি নয়। জমি, অর্থ, বাড়ি– এসবের মালিকানা আছে পুরুষের কাছে। জমি এবং পুঁজি যা খাটালে উদ্বৃত্ত তৈরি হয়, তাই তো সম্পত্তি। পুরুষদের কাছে এ ধারণা অস্পষ্ট নয়। পাতাইয়ের কেসস্টাডিতে দেখা যায়, অনুদান পাবার কিছুদিনের মধ্যে সে যে নিজের জন্য চেয়ার, মশারি, মুরগি কিনতে পেরেছে সেগুলোই সে তার সম্পদ মনে করছে।

Dhaka University Institutional Repository

এনজিও কর্মসূচির প্রভাবে এখনো নারী-পুরুষের সম্পদের মালিকানার ওপর সমান নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়নি বা উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন হয়নি। এটা যেমন এনজিও কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের জন্য সত্য, তেমনি সত্য মাঠকর্মী-কর্মকর্তার জন্য। এক্ষেত্রে দেখা যায়, অধিকাংশ নারী যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে পুরুষ সদস্যের ওপর নির্ভরশীল।

ক্ষুদ্র ঋণ, অতিদরিদ্র, শিক্ষা কর্মসূচি, আইনি সহায়তা কর্মসূচি প্রত্যেকটিতে সচেতনতামূলক নানা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যেখানে নারীর অধিকার বিষয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু এর ফলশ্রুতিতে নারীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখছে তা বলা যাবে না। দরিদ্র, অতিদরিদ্ররা পরিশ্রম করে বেঁচে থাকে। নারী-পুরুষ উভয়ই শ্রম দেয়। ফলে অনেক জায়গায় স্বামী/স্ত্রী অথবা পরিবারের নারী-পুরুষ সদস্য দু'জন মিলে সিদ্ধান্ত নেন; কিন্তু তার সংখ্যা খুবই কম। এনজিও প্রশাসনে যেসব নারী-পুরুষ মাঠকর্মী বা কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করছেন তাদের ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। যে নারী আয় করে, চাকরি করে তারও অনেক সময় স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী অর্থ খরচ করতে হয়। নিজের আয়-খরচে নিজের ইচ্ছার প্রাধান্য বা কর্তৃত্ব থাকার কথা থাকলেও তা থাকে না।

মাঠকর্মী রিয়েকা বেগম (কেসস্টাডি-৩) একজন উচ্চশিক্ষিত নারী, যিনি বর্তমানে ব্র্যাকে কাজ করছেন। অথচ তিনি তার আয়ের পুরো অর্থই স্বামীর কাছে তুলে দেন। স্বামী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আবার মহানন্দা মল্লিক (কেসস্টাডি-৪) একজন পুরুষ মাঠকর্মী যিনি পরিবারে নিজেই সিদ্ধান্ত নেন। বিয়ের একবছর পর তার স্ত্রী চাকরি ছেড়ে স্বামীর সহযোগিতা ও গার্হস্থ্য ব্যবস্থাপনার কাজে সময় দিচ্ছেন।

অন্যদিকে দেখা যায়, শিফা হাফিজা বা রফিকা আক্তারের মতো উচ্চপর্যায়ের প্রশাসকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিজেদের ভূমিকাই প্রধান। তাদের পরিবারে তারাই একমাত্র উপার্জনকারী, পুরুষরা নয়। এছাড়া সংগঠনের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে পৌঁছাতে তাদের যে কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে, সংগ্রাম করতে হয়েছে তার ফলে তাদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। কালিহাতির ফজিলা আক্তার লিপি (কেসস্টাডি-৫) ও তার স্বামী দু'জনের আয়ে সংসার চলে। ফজিলার নিয়মিত আয়ে সংসারের স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে নিজের আয় করা টাকা খরচের সিদ্ধান্তসহ পরিবারের অন্যান্য বিষয়ে তার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কিছু কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত ফজিলা স্বামীসহ নেয়। পিয়ারজান (কেসস্টাডি-৬) ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে সুদের ব্যবসা করে সংসার চালাচ্ছে। তার পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সে ভূমিকা নিচ্ছেন। কারণ পিয়ারজানই এখন পরিবারে একমাত্র কর্মক্ষম।

প্রাপ্ত তথ্যের ফলাফলের ভিত্তিতে বলা যায়, প্রশাসনিক কর্মী বা কর্মসূচির সুবিধাভোগী নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ বেড়েছে; কিন্তু সেই বৃদ্ধি কোনো নতুন রেখাপাত তৈরি করেনি।

গার্হস্থ্যকর্মে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ ক্ষমতায়নের অন্যতম শর্ত। অথচ পুরো গবেষণায় তথ্য সংগ্রহকালে দেখা যায়, গার্হস্থ্য কর্মের মধ্যে রান্নাবান্না, ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শিশু লালন-পালন এসব কাজ নারী সদস্যরাই করেন। একজন পুরুষ আর নারীর দৈনিক শ্রমঘণ্টা সমান নয়। শিশু লালন-পলনকারী এবং গার্হস্থ্যকর্মের দায়িত্ব কার হওয়া উচিত বা সমান হওয়া দরকার কিনা? এ বিষয়ে নারী-পুরুষ কর্মকর্তাদের মতামতের পার্থক্য দেখা যায়। শিফা হাফিজা, রফিকা আক্তার বা পারভীন মুশতারী এ কাজে উভয়ের অংশগ্রহণ হওয়া উচিত বলে সাক্ষাৎকারে জানান। কিন্তু বিদ্যমান বাস্তবতায় যে তা তৈরি হয়নি এটিও স্বীকার করেন। পুরুষ কর্মকর্তারা সাংসারিক দায়িত্ব ও শিশু লালন-পালনে নারীর ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দেন। এ বিষয়ে আফসান চৌধুরী বলেন, "সন্তান লালন-পালনের বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে পুরুষ প্রবেশ করতে পারে না এবং আমার কাছে মনে হয় এটা খুব মৌলিক। ... যেটা হয় যে, পশ্চিমা নারীবাদ মেয়েদের মৌলিক ক্ষেত্রটাকে অস্বীকার করতে চাই। তারা পুরুষ হওয়ার একটা চেষ্টা করে। পুরুষের ক্ষেত্র অকুপাই করাটা তাদের মূল থাকে। আমার মনে হয়, এটা কখনোই সম্ভব নয়।"

ফলে প্রাপ্ত তথ্য ও বক্তব্য পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে বোঝা যায় গার্হস্থ্যকর্ম ও শিশু লালন-পালনে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ এনজিওরা তাদের দলিলে কোথাও বললেও চর্চার ক্ষেত্রে এ অবস্থা অপরিবর্তিত।

বিনোদন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে এনজিও কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের সমান অংশগ্রহণ নেই। দরিদ্রদের খুব সামান্যই অবসর থাকে। এই অবসর সময় মেয়েরা কোনো না কোনো আয়সৃষ্টির কাজ করে। যেমন– কাঁথা সেলাই, পাটি বোনা, গরু-ছাগল দেখা ইত্যাদি। এর বাইরে বলতে গেলে ঘরের ভেতর গল্প করা, বড়জোর আশপাশে যে

Dhaka University Institutional Repository

কারোর বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া। আর পুরুষ প্রত্যেকে অবসরে হাটে বা গ্রামের মোড়ের হোটেলে-বাজারে চা খান, আড্ডা দেন, এলাকার নানা বিষয়–দেশীয় রাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন। ফলে দেখা যায়, অবসর দুজনের সমান মাত্রায় ঘটে না। গ্রামীণ দরিদ্র অক্লান্ত পরিশ্রম করে জীবন নির্বাহ করে। বঞ্চিত হয় শিক্ষার সুযোগ থেকে। ফলে বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতা বা সৃজনশীল কাজে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেখা যায় না। যতটুকুও অবসর মেলে তাতে নারীর ভাগেই কম পড়তে দেখা যায়।

পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে উৎসাহী করে তোলা এনজিও স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির অন্যতম। বর্তমানে সরকারের পাশাপাশি প্রচার মাধ্যম এনজিওর তৎপরতায় গ্রামে-গঞ্জে পরিবার পরিকল্পনার প্রচার ছড়িয়ে গেছে। এনজিওরা বলে থাকে, নারীরা জন্মনিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করছে, নিজের শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ বেড়েছে। সন্তানধারণের সিদ্ধান্ত নিজের হাতে। এখানে যেটা লক্ষ্য করা যায়, নারীরাই অধিকাংশ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করেন। ফলে জন্মহার নিয়ন্ত্রণও বেড়েছে। কিন্তু নারী পদ্ধতি গ্রহণ করে বলে কি তিনি জন্মহার নিয়ন্ত্রণে নিজেই ভূমিকা রাখেন? এ বিষয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। পদ্ধতি গ্রহণে যৌথতার বদলে পুরুষের তুলনায় নারীর পদ্ধতি ব্যবহারের হার বেশি। এর পেছনে কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়– পুরুষ বাইরের কাজ করে, পুরুষের স্বাস্থ্য ভালো রাখা দরকার, তাই নারীকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেহেতু নারী ঘরে গার্হস্থ্য কাজ করে, তার থেকে পুরুষের স্বাস্থ্যের গুরুত্ব বেশি সেহেতু নারীকেই পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে এমন মত পুরুষরা দেন। কোনো দম্পতি শারীরিক অবস্থার কারণে বা একাধিক সন্তান না চাইলে 'লাইগেশন' জন্মবন্ধ্যাকরণের জন্য অপারেশন করতে পারেন। এই পদ্ধতি উভয়ই গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশে দেখা যায়, পুরুষরা শারীরিক সুস্থতা দীর্ঘস্থায়ী করা, নারীর তুলনায় অধিক পরিশ্রমকারী হিসেবে এই পদ্ধতি গ্রহণ করেন না। এনজিও কর্মসূচির আওতাধীনদের মধ্যে যতগুলি অপারেশনের কেস পাওয়া যায়, যার বেশিরভাগই নারীর।

ফলে দেখা যায়, এনজিওর স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। কিন্তু রুহুল আমিনসহ অনেকে গবেষণায় যেটা দেখান, ক্ষুদ্র ঋণকর্মসূচিতে অংশ নিয়ে এবং স্বাস্থ্যসেবা পেয়ে নারীদের গর্ভধারণ হার বা বহু সন্তান আকাঙ্ক্ষা কমার সাথে সাথেই নারীর আত্মনির্ভরশীলতা বেড়েছে। নিজ শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতা বেড়েছে এটা সম্পূর্ণ সঠিক নয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় কর্তা পুরুষকে পদ্ধতি গ্রহণ অন্যের ওপর চাপানোর বিষয়ে আগ্রহী দেখা যায়। সুতরাং নারীর নিজ শরীরের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বেড়েছে এক্ষেত্রে বলা যাবে না।

রাজনৈতিক সচেতনতার দিকে নজর দেয়া যাক। রাজনৈতিক সচেতনতা বলতে কেবল মিছিল-মিটিং-সমাবেশ করার আগ্রহ বা অধিকারকেই বোঝানো হয় না। রাজনৈতিকভাবে সচেতন তখনই বলা যাবে, যখন কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী তার রাষ্ট্রীয় অধিকার, কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হবে। বিদ্যমান রাষ্ট্রের আইন-কানুন সম্পর্কে ধারণা রাখবে। পাশাপাশি নিজ ও সমগ্রের অধিকার খর্ব হয় এমন কিছুর বিরুদ্ধে লড়াই করা– এসব মিলিয়েই রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে ওঠে। এই সচেতনতার রূপ বোঝার জন্য বিভিন্ন কেসস্টাডির দিকে নজর দিতে হবে। এনজিও কর্মসূচিগুলোতে 'সামাজিক উন্নয়ন' 'আইন সহায়তা' ইত্যাদি নামে নানারকম সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ রয়েছে। যেগুলোর আলোকে পর্যালোচনা করা হয়। ব্র্যাকের টিইউপি কর্মসূচিতে ১০টি সামাজিক ইস্যু– **বাল্যবিবাহ, বিবাহ রেজিস্ট্রেশন, তালাক, যৌতুক, গ্রামীণ বিচারব্যবস্থা, পরিবার পরিকল্পনা, ভিটামিন 'এ'-এর ঘাটতি, ডায়রিয়া** ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে সচেতন করা হয়।

ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিতে দেখা যায়, পাশবইয়ের পেছনে একই ধরনের ১৮টি বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রতিজ্ঞা আছে। এগুলো প্রতি সাপ্তাহিক বৈঠকে পাঠ করানো হয়। **যেখানে দুর্নীতির প্রতিবাদ করা, পরিশ্রমে সংসারে উন্নতি আনা, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা, বিশুদ্ধ পানি পান, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, শাক-সবজি চাষ, বহু বিবাহ ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াই, ছেলেমেয়েকে সমানভাবে মানুষ করাসহ ক্ষুদ্র ঋণ লেনদেন সঠিক রাখার** বিষয় উল্লেখ আছে। এসব নিয়ে আলোচনাও করা হয়।

প্রশিকা ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির আওতাধীন নারীদের দরিদ্রায়ন প্রক্রিয়া ও দারিদ্র্যবিমোচন, নারীর ক্ষমতায়, পরিবেশ উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও শিশু এবং গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। নাগরিক উদ্যোগের নারী দলে নারীর ওপর বৈষম্যের কারণ, নারীর পুনঃউৎপাদনের অধিকার, পারিবারিক আইনসহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এনজিওত্রয়ের সচেতনতামূলক প্রচারণার প্রভাব নারীদের জীবনে কী মাত্রায় পড়েছে তা বোঝার জন্য ৮.৬.১/৮.৬.২ ছকে আমরা আগেই দেখেছি– নারী সদস্যদের সকলেই মেম্বার, চেয়ারম্যানের নাম জানেন, যেটা শহরে আমরা দেখি না। গ্রামের নারীদের মেম্বার-চেয়ারম্যানের নাম জানার পেছনে তাদের প্রাত্যহিক জীবনের সম্পর্ক আছে। অন্যদিকে শহরে ওয়ার্ড কমিশনারের নাম কিন্তু শহরবাসীর অনেকেই বলতে পারেন না। এক্ষেত্রে নারীরা সচেতন।

বিবাহ আইন সম্পর্কে অর্থাৎ রেজিস্ট্রেশন না করলে কী কী সমস্যা হয় তা সম্পর্কে নারীদের কিছুটা ধারণা বেড়েছে। তালাক সম্পর্কে এমনকি তালাকপ্রাপ্ত নারীরাও তেমন একটা ধারণা রাখেন না। উত্তরাধিকার সম্পর্কে কিছু ধারণা রাখেন। বাল্যবিবাহ এবং যৌতুকের মতো অপরাধ সম্পর্কে বহু প্রচারণা থাকলেও এনজিও কর্মসূচির আওতাধীন নারীদের মেয়ে সন্তানদের ১২/১৩ বছর বয়সে বিয়ে হতে দেখা যায়। কালিহাতির মর্জিনার (কেসস্টাডি -৭) মাত্র ১৩ বছর বয়সে তার বিয়ে হয়েছে। হাজেরা (কেসস্টাডি-২) যখন চারপাশের জগতকে ভালোভাবে বুঝে ওঠার ক্ষমতা তৈরি হয়নি, খেলার বয়স পার হবার আগেই মাত্র ১২ বছর বয়সে পরের বাড়িতে সংসার শুরু করে। শুধু তাই নয়, অংশগ্রহণকারীরা মেয়ে সন্তানদের ১২/১৩ বছর বয়স থেকেই বিয়ে দেবার চিন্তা করেন। বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে অবগত হলেও আর্থিক চাপ এবং মেয়েকে উপার্জনের উৎস না ভাবার কারণে পরিবারে ১৮ বছরের নিচে মেয়েদের বিয়ে দেয়া হচ্ছে।

অংশগ্রহণকারীরা 'যৌতুক' অপরাধ হিসেবে মানলেও মেয়ের বিয়ের খরচ এবং মেয়ের জামাইকে 'থোক' টাকা দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে। তাদের যদি প্রশ্ন করা হয়, যৌতুক দেয় কিনা, অধিকাংশই উত্তর দেয়, না। কিন্তু কৌশলে যখন প্রশ্ন করা হয়, মেয়ের বিয়েতে কত খরচ করেছেন, জামাইয়ের দাবি কত ছিল, কত পূরণ করেছেন, মেয়ের বিয়ের টাকা কিভাবে যোগাড় হবে। এসবের উত্তরে দেখা যায়, যৌতুকপ্রথা এখনো অব্যাহত আছে। অনেকে মনে করেন, মেয়েরা বাবার সম্পত্তির কম পায় কোথাওবা পায়ই না, ফলে তাকে কিছু হলেও দেয়া উচিৎ, মেয়েকে খালি হাতে পাঠালে স্বামীর অত্যাচার সইতে হবে ইত্যাদি। শুধু মেয়ের বিয়েতে যৌতুক দেন তাই নয়, ছেলের বিয়ের সময়ও যৌতুক নেন, ছেলের শ্বশুরবাড়ি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের সময় এমনও দেখা গেছে, ছেলের বিয়ে থেকে প্রাপ্ত যৌতুকের টাকা দিয়ে মেয়ের বিয়েতে গয়না বা কিছু টাকা দেয়া হচ্ছে। রওশন আরার (কেসস্টাডি-৮) জীবনেও দেখা যায়, তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ততদিন সমিতির সদস্য থাকবেন যতদিন না মেয়ের বিয়ে হচ্ছে। 'জামাই তো খালি মুখে মেয়ে নেবে না'– এ কথা বলেন রওশন আরা। অনেককে দেখা যায়, লোন নিয়ে মেয়ের বিয়ের খরচ চালাচ্ছে।

এনজিওর সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণে অন্যায়, দুর্নীতি, বহুবিবাহ, নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার ইত্যাদি বিষয়ের মাধ্যমে নারী তার অধিকার আদায়ে এবং অন্যায়ের প্রতিবাদে লড়াই-সংগ্রাম করার জন্য আহ্বান করে। কিন্তু এমন ব্যবস্থা রাখে, যার কারণে দেখা যায়, শতকরা ৭ ভাগ গড়ে কেবল প্রতিবাদ করেন। কিন্তু এই ৭ ভাগও বড় আকারের প্রতিবাদে অবস্থান নেয়। এই ব্যবস্থা হলো, প্রত্যেকটি এনজিও তাদের কর্মসূচিতে 'গ্রাম সহায়ক কমিটি', 'দারিদ্র্যবিমোচন কমিটি', 'গ্রাম সভা' ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রামীণ প্রভাবশালী ব্যক্তি, চেয়ারম্যান, মেম্বার, ইমাম, সাংবাদিক, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য এদেরকে দিয়ে কমিটি গঠন। এর পেছনে কারণ হিসেবে তারা উল্লেখ করেন, গ্রামীণ প্রভাবশালীরা যাতে দরিদ্রদের উন্নয়নের সহায়ক হয় তাই।

বাস্তবে দেখা যায়, এই কমিটি যেহেতু এনজিওর কর্মসূচির কাঠামোর মধ্যে থাকে ফলে এদের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ কখনো সংগঠিত হয় না। অথচ এলাকা দুর্নীতি এবং অন্যায়ের ঘটনার সাথে প্রভাবশালী এবং ক্ষমতাশীলদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যাপক অথবা পৃষ্ঠপোষকতা থাকে। যেমন গ্রামীণ দুস্থ নারীদের সরকারি আইজিভিজিডি কর্মসূচির মাধ্যমে চাল-ডাল দেয়ার কাজ ব্র্যাকসহ যৌথ উদ্যোগে করা হয়। এই কাজে যুক্ত থাকে ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার, চেয়ারম্যান। এই কর্মসূচির আওতাধীন ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতারা জানান, তারা কখনোই নির্ধারিত পরিমাণ চাল, গম পান না। খুবই পরিষ্কার ব্যাপার, সরকারি গম-চাল দিয়ে দুর্নীতির সাথে এলাকার চেয়ারম্যারন, মেম্বার যুক্ত থাকে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলে না। অশ্বদিয়ার হাজেরা (কেসস্টাডি-২) এ বিষয়ে বলেন, "আল্লাহর অস্তে পাওয়া চাল যে অল্প হলেও পাচ্ছি, এটাই নাকি বড় কথা বলেছেন চেয়ারম্যান। ৫ সের কম পেলাম, না বেশি পেলাম– এ নিয়ে কোনো কথা বলার সাহস আমাদের নেই।" প্রতিবাদ করার জন্য তাদের যে ঐক্য থাকা দরকার তা নেই। তারা তাদের ক্ষোভ নিজ দল বা এনজিও কর্মীদের কাছেই প্রশমন করেন। এর বাইরে তারা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামীণ দরিদ্র নারীরা নিজেদের অসন্তোষ, ক্ষোভ নিয়ে এই এনজিও কাঠামোর বাইরে যেতে পারেন না। তেমনি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের নারীরা যারা এনজিওতে শিক্ষক বা মাঠকর্মী হিসেবে কাজ করেন তাদের মধ্যে প্রতিবাদ করার হার নেই বললেই চলে। স্কুলশিক্ষিকা কামরুন্নাহার লাকী (কেসস্টাডি-১২) এ প্রসঙ্গে বলেন, "মেয়ে মানুষ বেশি বললে সমস্যা। তাই প্রতিবাদ বুঝেশুনে করতে হয়। বেশি বললে পরে সাক্ষীকে নিয়ে টানাটানি হবে। তাই যেখানে দেখি নিজের সমস্যা হবে না সেখানেই বলি। অন্য জায়গায় চুপ থাকি।" জরিপে লক্ষ্য করা হয়, অধিকাংশ কর্মসূচির সদস্যরা তাদের রাষ্ট্রীয় ও মৌলিক অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞ।

প্রাপ্ত তথ্যের ফলাফলের ভিত্তিতে দেখা যায়, এনজিও কর্মসূচির আওতাধীনদের রাজনৈতিক সচেতনতা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় তৈরি হয়নি। এনজিওরা রাজনৈতিক সচেতনতার কথা বললেও এমন কাঠামো নিজেরা গড়ে তুলে যার বাইরে যাবার সাধ্য থাকে না কারো। ওই কাঠামোর মধ্যেই তারা ঘুরতে থাকে। এখানেই একভাবে ক্ষোভ প্রশমিত করেন।

নারীর ক্ষমতায়নের জন্য যে বৈশিষ্ট্যগুলোর দিকে গুরুত্বারোপ করার বিষয়ে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে, তার আলোকে প্রাপ্ত তথ্যের ফলাফল পর্যালোচনায় দেখা যায়, অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যই এনজিও কর্মসূচির পক্ষে পূরণ করা সম্ভব নয়। নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে এনজিও ও বিভিন্ন মহলের বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট যে, এখনো এ বিষয়ে ধারণাগত বিশ্লেষণের সামগ্রিক দিকটি স্পষ্ট নয়। ক্ষমতায়নের দৌড় প্রতিষ্ঠানে নারীদের জন্য আলাদা টয়লেট নির্মাণ প্রসঙ্গ থেকে কর্মসূচির অংশগ্রহণকারীদের কিছু গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং সবশেষে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হতে পারার মধ্যেই সীমানা টানে এনজিওরা। কেউ কেউ এক্ষেত্রে রাষ্ট্রনীতির এবং সরকারের ভূমিকা একই সাথে নারীবিষয়ক সংগঠনগুলোর এ বিষয়ে করণীয় গুরুত্বপূর্ণ বলে মত প্রকাশ করেন। সামগ্রিক দিক থেকে এ বিষয়টিতে অনিবার্যভাবে রাষ্ট্রীয় নীতি ও মতাদর্শের প্রশ্ন সামনে আসে। যা ব্যক্তি পর্যায়ে ভাবনার মধ্যে কিছু কিছু দেখা গেলেও সাংগঠনিক পর্যায়ে দেখা যায় না। কৌশলগতভাবে এ বিষয়কে এড়ানো হয়। এর কারণ রাষ্ট্রীয় নীতি-মতাদর্শের প্রশ্ন সামনে আনলে রাষ্ট্রকাঠামোয় নারীর অবস্থার পরিবর্তনের বিষয়টিকে সামনে আনতে হয়। রাষ্ট্রকে সমালোচনা করতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রাসঙ্গিকতা আবার দেশী-বিদেশী অনুদান বন্ধ হবার সম্ভাবনা বা ঝুঁকির বিষয়টিও বিবেচনায় থাকে। কিন্তু এনজিওরা যেহেতু রাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং সরকারের নীতিকে প্রশ্ন না করে বরং তাদের সঙ্গতি ও সমঝোতা বজায় রেখেই কাজ করে ফলে তাদের কাজের বিস্তার কিছু সূচক ও খণ্ডিত রূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যেখানে অবস্থান নয় অবস্থা পরিবর্তনের বিষয়টি প্রধান থাকে। এনজিওর কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো– এর তৎপরতার মধ্য দিয়ে নারীর অবস্থার ক্ষেত্রে কিছু কিছু যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা সামগ্রিক অবস্থান পরিবর্তনের সংগ্রামে নারীর প্রস্তুতির শর্ত হিসেবে যুক্ত হচ্ছে। নারীর অর্থনৈতিক কাজে সম্পৃক্ততা ও গতিশীলতার বৃদ্ধি এবং সাধারণভাবে চেতনার পরিধির বিস্তার তার ভেতরে নিজ অবস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন তৈরি করছে। স্বল্পমাত্রায় হলেও স্বতন্ত্র চিন্তার প্রসার ঘটাচ্ছে। যে প্রসার একই সাথে এনজিও কাঠামোর মধ্যকার সমস্যা ও সীমাবদ্ধতাকে প্রশ্ন করার মতো সক্ষমতা তৈরির সম্ভাবনাকেও জাগিয়ে তুলছে।

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

পুরো গবেষণায় এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, নারীর ক্ষমতায়ন, 'উন্নয়নে'র স্রোতে নারীকে যুক্ত করা, নারী-পুরুষ সমতা বিধান ইত্যাদি বিষয় এনজিও কার্যক্রমের অন্যতম প্রধান কর্মসূচি-এজেন্ডা কিংবা ইস্যুতে পরিণত হয়েছে ঠিকই, এমনকি কার্যক্রমের বিস্তারও ঘটেছে বিপুলভাবে, কিন্তু বাস্তবত ঐ নির্দিষ্ট বিষয়গুলোতে যে প্রচলিত মানদণ্ড ব্যবহৃত হয় তার ভিত্তিতেও অগ্রগতি খুব বেশি হয়নি। এর কারণ সম্ভবত এই যে, নারী প্রশ্ন এনজিও কার্যক্রমের অন্যতম কর্মসূচি-এজেন্ডায় পরিণত হওয়ার পেছনে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় বাংলাদেশের মতো প্রান্তস্থ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে এনজিও কার্যক্রমের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা, নারীর শ্রমশক্তিকে বাজারের সাথে যুক্ত করা এবং উভয় লক্ষ্য পূরণে ডোনারদের শর্তই, মূল তাগিদ হিসেবে কাজ করে। নারীর অধঃস্তনতা এবং এ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি পরিবর্তন এক্ষেত্রে মুখ্য বিষয় হিসেবে থাকে না। এ বিষয়ে এনজিওদের কোনো কর্মসূচি বা লক্ষ্য নেই। এদের কর্মকাণ্ড তাই এই ভিত্তিকে অক্ষত রেখে এই কাঠামোর মধ্যেই সংস্কারধর্মী কাজের সীমা অতিক্রম করে না। এ কারণেই নারীর ক্ষমতায়নও সেই সীমায় আটকে থাকে।

যেমন প্রশাসনে নারীর অবস্থা পর্যালোচনায় দেখা গেছে এক্ষেত্রে নারীর সংযুক্তি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ঘটলেও আনুপাতিকহারে সংখ্যা এখনো অনেক কম। আবার গুণগত দিক বিচার করে দেখা যায় প্রশাসনের নিচের দিকে কাজের ধরনে নারী-পুরুষের একধরনের সমতা থাকলেও উচ্চপর্যায়ে তা অনুপস্থিত। নীতিনির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ সরব নয়। এখন পর্যন্ত সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নারীর কাজ হিসেবে 'গার্হস্থ্য-কর্ম, সংসারের দেখভাল এবং শিশুপালন'কেই প্রধান করে দেখা হয়। নারীর ওপর চেপে থাকা এই বাড়তি ভার দূর করার কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেই। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রশাসনের কাজকে ক্যারিয়ার হিসেবে নিতে পারে না নারীরা। সে কারণে প্রশাসনিক পদবিন্যাসের ক্রম উচ্চপর্যায়ে নারীর ঝরে পড়ার সংখ্যাই বেশি। 'জেন্ডার', 'উন্নয়ন', 'নারীর ক্ষমতায়ন' ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা ও প্রশিক্ষণ চললেও কাগজে-কলমে যতটা ব্যাপক মনে হয় চর্চার ক্ষেত্রে প্রশাসনের অভ্যন্তরে তার কার্যকারিতা ততটা নেই। সেদিক থেকে এসব প্রশিক্ষণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পর্যবসিত হয় আনুষ্ঠানিকতায় অথবা আটকে থাকা কিছু শব্দ পরিচিতির মাঝে।

এছাড়া প্রশাসনের অপেক্ষাকৃত নিচের দিকে এখনো নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পুরনো ধরনই বেশি শক্তিশালী। উচ্চপর্যায়ে একই অবস্থা থাকলেও তার প্রকাশ নিচের পর্যায়ের মতো প্রকট নয়। পুরুষরা তাদের নারী সহকর্মীদের কাজের পরিচয়কে বড় করে না দেখে প্রধানত নারী হিসেবেই দেখেন। বিবাহিত পুরুষ কর্মীদের অধিকাংশের স্ত্রীরা পরিবারে স্বামীর সহযোগী এবং সংসার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন। অন্যদিকে যেসব ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী দু'জনই পেশার সাথে যুক্ত সেখানেও নারী একাই পারিবারিক ঐসব দায়িত্ব পালন করেন। যার ফলে কর্মজীবী নারীর শ্রমঘণ্টা একজন পুরুষের তুলনায় বৃদ্ধি পায় এবং একটা পর্যায়ের পর পেশায় নারীর মনোযোগ-দক্ষতা-সৃজনশীলতার ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতার কারণে কিছুটা আপেক্ষিক সুবিধা তারা পান, কিন্তু নিচের দিকে সেটাও থাকে না। সে কারণে ক্ষমতায়নের সূচকগুলো তাদের বেলায় সীমিত হয়ে পড়ে। সুতরাং গবেষণা থেকে বলা যায়, প্রশাসনে নারীর অবস্থা ব্যক্তি বা মানুষ হিসেবে এখনো দুর্বল।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিপর্যায়ে কোনো কোনো নারী প্রশাসনের কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত অনেক সংগ্রাম করে টিকে আছেন ঠিকই কিন্তু এদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। অর্থাৎ এখনো পর্যন্ত এটা কোনো সাধারণ প্রবণতা নয়।

তবে দেখা যায়, এনজিও প্রশাসনে যেসব নারীরা কাজকে ক্যারিয়ার হিসেবে নিতে আগ্রহী তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যমাত্রায় না হলেও একটা অংশের পরিবারে ভাঙন, বিবাহ বিচ্ছেদ, বিবাহিত থেকেও পৃথক বাস, বিয়ে না করা, প্রচলিত বিয়ের বয়সসীমা না মানা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যা থেকে বোঝা যায়, নারী যত বেশি অর্থকরী কাজে যুক্ত হচ্ছে ততই তার মধ্যে চিন্তার স্বাতন্ত্র্য এবং ব্যক্তিত্ববোধ বাড়ছে। ফলে সমাজ সৃষ্ট বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি, সম্পর্ক এবং অবস্থা মেনে নেয়া তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ছে। বাড়ছে নারী-পুরুষ সম্পর্কের প্রচলিত ধারণার সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাত। তবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এক্ষেত্রেও যেমন তেমনি সাধারণভাবে যে কোনো ক্ষেত্রে প্রশাসনের কর্মীদের বঞ্চনা ও অপ্রাপ্তির বোধ কিংবা নানা বিষয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত বাড়লেও এসব বিষয় নিয়ে লড়াইয়ের কোনো আগ্রহ থাকে না। কেননা এনজিও প্রশাসনের মধ্যে কর্মীদের লড়াই-সংগ্রামের কোনো কার্যকর কাঠামো নেই। সারাদেশে এক্ষেত্রে প্রায় লক্ষাধিক কর্মী থাকলেও তাদের ট্রেড ইউনিয়ন কিংবা কোনো ধরনের সমিতি করার অধিকার এনজিওতে স্বীকৃত নয়।

অন্যদিকে এনজিও কার্যক্রমের ক্ষেত্রে দেখা যায়, দেশের নারীদের একটা বড় অংশ এনজিওর অর্থনৈতিক অর্থাৎ ঋণ কর্মসূচিসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজসচেতনতামূলক ও আইনি অধিকার বিষয়ক নানা কর্মসূচিতে যুক্ত হয়েছে। এর প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে নারীর সামাজিক গতিশীলতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু ক্ষমতায়ন কিংবা নারী-পুরুষ সম্পর্কের সমতা বিধানের ক্ষেত্রে এমনকি এনজিও নির্ধারিত সূচক অনুসারেও অগ্রগতি খুব উল্লেখযোগ্য নয়।

যেমন ঋণ কর্মসূচির ফলাফল হিসেবে নারীদের উল্লেখযোগ্য অংশের শ্রমশক্তি বাজারের সাথে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু এই সংযোগের মাধ্যমে নারী যে মূল্য তৈরি করছে তার মালিকানা নারীর হাতে নেই। সম্পদ নিয়ন্ত্রণে পরিবারের প্রচলিত পদ্ধতি এখনো পুরোপুরি কার্যকর আছে। তাছাড়া নারীর শ্রমশক্তি বাজারের সাথে যুক্ত হওয়ার বিষয়টিতেও সমস্যা আছে। প্রথমত উল্লেখযোগ্য অংশের ক্ষেত্রে দেখা গেছে নারীরা ঋণ নিচ্ছেন তার স্বামী কিংবা পরিবারের পুরুষ সদস্যদের জন্য। নারীর পেশা নির্বাচনে সামাজিক বিধি-নিষেধ এক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের সহযোগী হিসেবেই আটকে রেখেছে। দ্বিতীয়ত টার্গেট গ্রুপ হিসেবে নারীকে অগ্রাধিকার দেয়া হয় যতটা না নারীর শ্রমশক্তি বাজারের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য তার চেয়ে বেশি ঋণ ফেরত পাবার নিশ্চয়তার জায়গা থেকে। এই নিশ্চয়তা যেসব অনুমিতির ওপর ভিত্তি করে আছে তা নারীর অধঃস্তনতার সাথেই সম্পর্কিত। ফলে এনজিওদের অবস্থান এক্ষত্রে স্ববিরোধী। এটি স্পষ্ট যে, ঋণ কার্যক্রম অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঋণের চক্রেই আটকে রাখে। ফলে এক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতার মানদণ্ডেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নেই। তবে এসব সত্ত্বেও ঋণ কার্যক্রম নারীর সাধারণ গতিশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ঋণ আর কিস্তির প্রয়োজনে অল্প-বিস্তর হিসাব জ্ঞানসহ, অনেক বিষয়ে আগের চেয়ে ধারণার পরিধি বিস্তৃত করেছে।

পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, নারীর জন্য প্রচলিত পেশা বা কাজের তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। পূর্বে নারীরা যেভাবে গরু-ছাগল লালন-পালন, ধান মাড়াই ইত্যাদি পরোক্ষ কৃষিসহ অন্যান্য নানা কাজ করতো এখনো তাই করছে। সরাসরি কৃষির সাথে সম্পর্কিত কাজ এখনো পুরুষরাই করছে। গৃহস্থালি কাজ এবং শিশু লালন-পালনের সমস্ত দায় নারীকেই গ্রহণ করতে দেখা যায়। সম্পত্তির মালিকানা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রধান ভূমিকা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষের। যেখানে নারী উপার্জনকারী, তালাকপ্রাপ্তা, বিধবা, কিংবা স্বামী বেকার– কেবল সেসব জায়গায়ই সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীকে ভূমিকা রাখতে দেখা যায়।

সেবা কার্যক্রমে দেখা যায়, এনজিও স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে যেটি গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয়ে থাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী পদ্ধতি গ্রহণ করে বলে সন্তান ধারণ ও নিজের শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তার বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বিষয়টিকে একটু সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বরং উল্টো চিত্র পাওয়া যায়। তথ্যে দেখা যায়, অধিকাংশ স্বামীরা কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করে না, কারণ পরিবারের উপার্জন বা রুটি-রুজির কাজ প্রধানত পুরুষ করে বলে স্ত্রীর তুলনায় স্বামীর স্বাস্থ্য ভালো থাকার বিষয়টি এখানে অধিক গুরুত্ব পায়। ফলে এক্ষেত্রে সমান অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে। সুতরাং নারীর শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ বেড়েছে এ বিষয়টি পুরোপুরি সঠিক নয়।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক সচেতনতার ক্ষেত্রে দেখা যায়, এনজিও প্রতিনিধিরা কর্মসূচির সদস্যদের রাজনৈতিক সচেতনতাকে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে। সচেতনতামূলক নানা প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচির মাধ্যমে নারীদের কেউ কেউ বের হয়ে আসছেন ঠিকই কিন্তু তা উল্লেখযোগ্য নয়। এনজিওরা সচেতন হতে-নানা বিষয়ে প্রতিবাদ করতে বলে কিন্তু এমন কাঠামো তৈরি করে রাখে যাতে তারা 'গ্রামীণ এলিটদের' নিয়ে গঠিত কাঠামোর গণ্ডির বাইরে ক্ষোভ প্রকাশ না করে।

নারীর ক্ষমতায়ন অথবা নারী-পুরুষ সমতা বিধানের প্রশ্নটি রাষ্ট্রীয় নীতি ও আদর্শের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রাষ্ট্রীয় নীতির মধ্যে আদর্শিকভাবে নারীর অধঃস্তন অবস্থাকে যেভাবে গ্রহণ করা হয় তার বিরুদ্ধে এনজিওদের জোরালো কোনো কর্মসূচি নেই। তবে নারীর জন্য বৈষম্যমূলক রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের বিরোধিতায় কিছু তৎপরতায় রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে আইনি সহায়তা কার্যক্রমেই তা প্রধানত সীমাবদ্ধ, আইন পরিবর্তনের তৎপরতায় অন্তত বৃহৎ এনজিওদের অবস্থান শক্তিশালী নয়।

সবশেষে বলা যায় নারীর ক্ষমতায়ন বা অবস্থানের নয় বরং অবস্থার পরিবর্তনে রয়েছে এনজিওর ভূমিকা। অর্থনৈতিক কাজে অংশগ্রহণসহ কিছুমাত্রায় আইনি সচেতনতা ও হিসাব জ্ঞানের বৃদ্ধি, ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে সরাসরি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি নানা তৎপরতায় নারীর সংযুক্তির ফলে একদিকে তার গতিশীলতা পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি অন্যদিকে তা নারীর মধ্যে নিজ দেনা-পাওনা বিষয়ে প্রশ্ন তৈরি করছে, অল্পবিস্তর স্বতন্ত্র চিন্তারও প্রসার ঘটাচ্ছে। এই বাস্তবতা ভবিষ্যতে নারীর নিজ সামাজিক অবস্থান ও অধিকার সম্পর্কে আরো সচেতন হওয়ার ক্ষেত্রকেই প্রসারিত করার সম্ভাবনা নির্দেশ করে। যে ক্ষেত্র এনজিও কাঠামোর মতাদর্শিক ও প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতা ও সংকটকে প্রশ্ন করতে সক্ষম হবে, যা নারীর ক্ষমতায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

প | রি | শি | ষ্ট

কেসস্টাডি, প্রশ্নমালা, অর্গানোগ্রাম ও গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

কেসস্টাডি, প্রশ্নমালা অর্গানোগ্রাম ও গ্রন্থপঞ্জি

কেসস্টাডি

পাতাই

সদস্য অতিদরিদ্র কর্মসূচি
পূর্বইটখোলা, নীলফামারী সদর

নীলফামারী সদর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে পূর্বইটখোলায় ২ শতাংশ জমিতে ছোট্ট ঘর তুলে থাকেন পাতাই। নিজের জমানো ৪ হাজার টাকা দিয়ে কিনেছেন এইটুকু বসতভিটা। অল্প বয়সেই পাতাইকে বিয়ে করতে হয় পরিবারের আর্থিক চাপ লাঘবের জন্য। ১৫/১৬ বছরের কিশোরী পাতাই'র দ্বিগুণ বয়সী একজনের সাথে বিয়ে হয়। পাতাই'র এটি প্রথম স্বামী। পাতাই'র প্রথম স্বামী আগে আরো দুটি বিয়ে করেছিল। মানসিক ও একাসিয়া রোগে আক্রান্ত প্রথম স্বামীর সংসারে কিছুদিনের মধ্যেই দুর্যোগ নেমে এলো। তালাক হলো প্রথম স্বামীর সাথে। ১ বছর পর আবার বিয়ে হলো এক রিকশাচালকের সাথে। এ সংসারেও ভাত জোটেনি পাতাই'র। এ সংসারেও ভাঙন হয়। স্বামীর সংসার ত্যাগ করে পাতাই জীবন-সংগ্রামে একাই ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর বিয়ে না করে কাজ করে অন্যের বাড়িতে। মাসে ১৫০ টাকার বিনিময়ে পাশের উকিল বাড়িতে কাপড়-চোপড়-থালা-বাসন ধোয়া, রান্নাবান্না, বাচ্চা দেখাশোনার কাজ করে প্রায় ৩ বছর। অন্যের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করতে গিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রমে পাতাই ক্লান্ত হলেও হাল ছাড়ে না। কাজের অভাবে অন্যের বাড়িতে পড়ে থাকাই তার একমাত্র গতিতে পরিণত হয়।

তৃতীয়বার বিয়ের কথা চিন্তাও মাথায় আনেন না একবারের জন্য। বিয়ে সংসার এখন তার কাছে দুঃস্বপ্নের মতো। একা নিজের মতো থাকাকেই সে অনেক স্বচ্ছন্দ্যের মনে করছে। পাতাই তার নিজ ভাষায় বিয়ে বিষয়ে উল্লেখ করে বলেন, 'কপালের দোষে ২ বার ঘর ভেঙেছে। আর না। দু'বার কেলেঙ্কারির মধ্যে গেছি আর যেতে চাই না।'

অন্যের বাড়িতে গার্হস্থ্যঘানি টানতে যখন পরিশ্রান্ত পাতাই, সে সময় পূর্বইটখোলা অঞ্চলে ব্র্যাক বাছাই শুরু করে কারা টিইউপি সদস্য হতে পারে। পাতাই'র নাম যুক্ত হয় টিইউপি তালিকা। তালাকপ্রাপ্ত পাতাই ব্র্যাক থেকে ৬ হাজার টাকায় ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করে। শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট কিনে বাড়ি বাড়ি বিক্রি করে সে। দিনে ৩০/৪০ টাকা কোনোদিন ৫০ টাকা লাভ হয় তার। টিইউপি সদস্যদের যে সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হয় সেও সেই হিসাব খুলেছে। ৭০টা ভাতাসহ জমা দিয়ে তার সঞ্চয়ী হিসাবে এখন জমা আছে ১৬শ' টাকা।

ব্যবসার টাকায় পাতাই'র সংসারে এখন দুটো চেয়ার, মশারি, চাদর আর মুরগি কেনা হয়েছে। একাই থাকে পাতাই। শাক-সবজি-আলু-ডাল খেয়ে দিনাতিপাত করছে পাতাই। '৪ টাকা দামের ডিম আর ১শ' টাকা কেজি দরের মাংস গরিব মানুষের খাবারের জন্য না' বলে উঠে পাতাই। আগে ১ বেলা খেত এখন ৩ বেলা খায়। একটা কাপড় বছরে পরতো, এখন তিনটা। প্রয়োজনে আরো বেশি পরতে পারে। পাতাই'র কাছে উন্নতি এটাই। এভাবেই

Dhaka University Institutional Repository

বেঁচেবর্তে থাকতে চায় সে। ব্র্যাক ক্ষুদ্র ঋণ নেবার জন্য পরামর্শ দিলেও সে নিতে রাজি নয়। লোনের টাকায় বড় ভয় তার। 'ঘরে যদি একজন মারাও যায় তবু লোন শোধ করা লাগে'। এই ভয় তাড়া করে তাকে। স্বামী ছাড়া একা একা এই জীবনে ঋণের বোঝা চাপাতে চায় না সে।

পাতাই'র জীবনের উন্নতির একটা সংজ্ঞা সে দেয়। যেখানে কোনোমতে বেঁচে থাকা, টিকে থাকাই প্রধান– সেটাই উন্নতি। পুষ্টি সচেতনতা, সামাজিক সচেতনতা এসবের প্রভাব তার জীবনের যাত্রায় কতটাই বা পরিবর্তন এনেছে?

তবে আগের চেয়ে স্বচ্ছল আছে, টিকে আছে সে। 'স্বামী নেই। নিজের মতো আছি, ধরার কেউ নেই। যদি আমার ছেলেমেয়ে থাকতো আর স্বামী পালিয়ে যেত তাতে কষ্ট তো আরো বাড়তো। ঘর সংসারে যে মনের সুখ তা 'আউলায়' গেছে আর হবে না– একা থাকায়, নিজের চেষ্টায় ভালো থাকাই বড় কথা।'

এভাবেই প্রশান্তির মধ্যে দিন কাটাচ্ছে পাতাই'র মতো আরো অনেকে ব্র্যাক টিইউপি সদস্য হয়ে আগের চেয়ে চারপাশকে বোঝার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে তাদের। জীবন কাটছে সংগ্রামে।

২

হাজেরা
ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি ঋণগ্রহীতা
অলীপুর, অশ্বদিয়া, নোয়াখালী

নোয়াখালী অশ্বদিয়া ইউনিয়নের অলীপুর গ্রামের দরিদ্র পরিবারের মেয়ে হাজেরা। ওর বিয়ে হয়েছে ১২/১৩ বছর বয়সে একই গ্রামের রিকশাচালক জসিম উদ্দীনের সাথে। খুব অল্প বয়সে যখন চারপাশের জগতকে ভালোভাবে বুঝে উঠার ক্ষমতা হয়নি, যখন পর্যন্ত খেলার বয়স পার হয়নি সেসময় হাজেরাকে পরের বাড়িতে ঘর-সংসার শুরু করতে হয়। এই দুনিয়ায় হাজেরার এখন স্বামী-সন্তান-শাশুড়ী ছাড়া আর কেউ নেই। আজ থেকে ৫ বছর আগে হাজেরার বাবা মারা গেছে আর বাবা মারা যাবার ২ বছরের মধ্যে মাও পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। তার স্বামী জসিমউদ্দীনের বাবাও মারা যান যখন জসিমের বয়স মাত্র ২১ দিন। এরপর জসিমের মা ভিক্ষা করে কোলে পিঠে নিয়ে তাকে বহু কষ্টের পথ অতিক্রম বড় করে তোলে। জোহরা-জসিম দুজনই এই সংসারে অনেক অসহায়। স্বামীর নামে মাত্র দেড় কাঠা জায়গায় হাজেরা স্বামীর সাথে সেখানে কোনোমতে স্বামী ৩ ছেলে-মেয়ে-শাশুড়ী নিয়ে মাথা গুঁজে বসবাস করছে। মাথার ওপরের ছনের ছাদটাও নড়বড়ে। বৃষ্টি-বাদলে এর অবস্থা বার বার দূর্গতির কথা মনে করিয়ে দেয়।

হাজেরার ১ মেয়ে আর ২ ছেলে। বড় মেয়ে ব্র্যাক স্কুলে ৩য় শ্রেণীতে পড়ছে আর ছোট দু ছেলের একজনের বয়স ৫ বছর অন্যজনের ৬ মাস। ১২ বছরের দীর্ঘ দিনের সংসারে অন্যের বাড়িতে কাজ করে আর স্বামীর রিকশা চালানো উপার্জন দিয়ে বহু কষ্টে বেঁচে আছে সে। একবেলা খাবার জোটে তো অন্যবেলা অনিশ্চয়তায় থাকতে হয়। কাজ না পেলে, স্বামীর রোজগার না হলে, না খেয়ে থাকার দশা হয়। "অনাহার অনটনে সংসসারে ঝগড়া বিবাদ লেগে থাকে তবু স্বামীর ঘর ছাড়া আর পথ নাই" বলে ওঠে হাজেরা। "মরা পর্যন্ত স্বামীর ঘরেই থাকতে হবে"। অল্প আয়ে দিন চলে না, যা উপার্জন করে তাও আবার রিকশার মালিকের ধার শোধ করতে হয়। এই ধরনের অবস্থার মধ্যে ব্র্যাকের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি সম্পর্কে অবগত হয়ে জোহরা আর তার স্বামী পরামর্শ করে লোন নেয়। ঋণ নিয়ে প্রথমে ৩ হাজার টাকা নিয়ে স্বামীর জন্য একটা রিকশা কেনে। এর কিছুদিনের মধ্যে তারা টের প্রায় গ্রামাঞ্চলে রিকশা চালিয়ে খুব একটা লাভের কোন সুযোগ নেই কারণ সব সময় 'খেপ পাওয়া যাবে এমন নিশ্চয়তা নেই' তাই নতুন করে সমস্যা সমাধানের জন্য আবারো লোন নেয় ৫০০০ টাকা। এই টাকা আর আগের রিকশা বিক্রি করে চা'র দোকান দেয় সেখানেও এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে,আবারও রিকশা চালানোর পেশায় ফিরে আসতে হয় জসিমউদ্দীনের।

আগের থেকে কিছুটা ভালো আছে তারা। এখন কোনোমতে শাক-লতা-পাতা খেয়ে দিন চলে যায়। নিজেদের

Dhaka University Institutional Repository

২/১ টাহাস-মুরগি যা আছে তা আর ছেলে-মেয়েকে শখ করে খাওয়াতে পারে না। ডিমও বিক্রি করে ঋণের কিস্তি শোধ করতে হয়। কখনোবা মুরগিটাও বিক্রি করতে হয়। "কিস্তি পরিশোধ করতে না পারলে লোন অফিসের লোকরা গালাগালি করে। বারবার বাড়ি এস নানাভাবে চাপ দিতে থাকে। মানসম্মানের ভয়ে যে কোনো উপায়ে কিস্তি শোধ করতেই হয়।"– বলেন হাজেরা।

আইজিভিজিডি সদস্য জোহরার মাসে সরকারের কাছ থেকে ৩০ কেজি গম-চাল বা আটা পাবার কথা। ব্র্যাক সরকারকে এই কর্মসূচি পালনে সহায়তা করে। কিন্তু জোহরা বলে উঠে' আল্লারস্তে পাওয়া চাল যে অল্প হলেও পেয়েছি এটাই নাকি বড় কথা বলেন এলাকার মেম্বর চেয়্যারম্যান। ৫ সের কম পেলাম না বেশী পেলাম এ নিয়ে চোখ তুলে কথা বলার সাহস আমাদের কই?' প্রতিবাদ করার জন্য যে ঐক্য অন্যদের মধ্যে থাকা দরকার তা নেই। সবাই ভয়ে যা বলার ঘরেই বলে বাইরে বলে না।

৩

রিয়েকা বেগম
কর্মসূচি সংগঠক
কামরাঙ্গীরচর শিক্ষা কার্যক্রম, ব্র্যাক

এনজিওকর্মী রিয়েকা বেগম ব্র্যাকে শিক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত আছেন প্রায় আড়াই বছর। এর আগে তিনি আরো দেড় বছর নেত্রকোনার পূর্বধারা অঞ্চলে ব্র্যাকে কাজ করেছেন। রিয়েকা কিশোরগঞ্জের বাসিন্দা, এখন কল্যাণপুরে থাকেন। কল্যাণপুর থেকেই কামরাঙ্গীরচরে অফিসে আসেন সকাল সাড়ে ৭টার মধ্যে রিকশা, বাস, টেম্পো– এসব মিলিয়ে। এখানে রিয়েকা কর্মসূচি সংগঠক হিসেবে সপ্তম স্তরে চাকরি করছেন। এমএ পাস সবাইকে সপ্তম স্তর দেয়া হয়।

কিশোরগঞ্জেই রিয়েকার শৈশব-কৈশোর পার হয়েছে। বাবা ছিলেন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে ছোটবেলা থেকেই আবৃত্তি-গান এসবের চর্চা করতেন। হাতের কাজে জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কারও পেয়েছিলেন। এসভি সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে এসএসসি আর গুরুদুয়ারা থেকে এইচএসসি পাস করেন তিনি। এরপর চলে আসেন ঢাকায়, ভর্তি হন জগন্নাথে। ভূগোলে অনার্স, মাস্টার্স শেষ করেন জগন্নাথ কলেজ থেকেই।

ছোটবেলায় কলকণ্ঠ সাহিত্যচক্রে কবিতা আবৃত্তি শেখা আর একটু বড় হয়ে বুলবুল ললিতকলায় ৪ বছর আর ছায়ানটে ২ বছর রবীন্দ্র সঙ্গীত চর্চা করলেও শেষ পর্যন্ত এই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে পারেননি তিনি পারিবারিক-সাংসারিক ঝামেলায়।

রিয়েকার ২ বোনের মধ্যে বড়। রিয়েকার বিয়ে হয়েছে ৭ বছর। তার ছোট দুটো ছেলে আছে। একজনের বয়স সাড়ে ৪, অন্যজনের ৩ বছর। এই ৭ বছরের বিবাহিত জীবনে সন্তান ধারণের সময় ছাড়া পুরোটা সময়জুড়েই রিয়েকা 'নরডেট ২৮', 'মিনিকন পিল' খেয়েছেন জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য। স্বামীর জন্মনিয়ন্ত্রণ গ্রহণে আগ্রহ না থাকায় তাকেই টানা এত বছর ওষুধ খেতে হচ্ছে। এই ওষুধ টানা খাবার ফলে শরীরের কি পরিণতি হতে পারে তা সম্পর্কে রিয়েকা অবগত নয়। ঘর-সংসারের যাবতীয় কাজ তিনি করেন। মাসের পুরো বেতন সাড়ে ৮ হাজার টাকাই স্বামীর হাতে তুলে দেন। এরপর প্রয়োজনে স্বামীর কাছ থেকে চেয়ে নেন।

রিয়েকার প্রতিদিনের জীবন শুরু হয় কাকডাকা ভোরে। ৫টার আগেই ঘুম থেকে উঠে ঘরের রান্না-বান্না সেরে বাচ্চা-স্বামীর প্রয়োজনীয় কাজগুলো সেরে অফিসে রওয়ানা দেন সাড়ে ৬টার মধ্যে। কল্যাণপুর থেকে কামরাঙ্গীরচরের দূরত্ব কোনদিনই আর কম মনে হয় না। প্রথমে বাস তারপর নিউমার্কেট থেকে টেম্পো আবার রিকশায়। প্রায় প্রতিদিন ৮০/৯০ টাকা আসা-যাওয়া-খাওয়া খরচেই চলে যায়। প্রতিদিন রিয়েকা ম্যানেজার-ইনচার্জের কাছে রিপোর্ট করে নির্ধারিত রুটিনমাফিক মোট ৫টা স্কুল পরিদর্শন করেন। স্কুলের পড়াশোনা কেমন

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে এ বিষয়ে রিপোর্ট করেন কাজ থেকে ফিরে ম্যানেজার-ইনচার্জকে। মোটরসাইকেলে ঘুরে কাজ করেন তিনি। অফিস থেকে বের হতে হতে সন্ধ্যা ৬টা বেজে যায়। বাড়ি ফিরতে ফিরতে সময় প্রায় সন্ধ্যা ৭টা, সাড়ে ৭টা। বাড়ি ফিরে ক্লান্তি কাটতে না কাটতেই আবারও ঘর-সংসার-স্বামী-সন্তান সবার দেখাশোনা তাকেই করতে হয়। অবসর খুব একটা পান না তিনি। পেলে গান শোনেন, বই পড়েন আর স্মৃতিচারণ করেন শৈশব-কৈশোরের দিনগুলোর।

৪

মহানন্দা মল্লিক
উন্নয়ন কর্মী, প্রশিকা
মোহাম্মদপুর, ঢাকা

মহানন্দা মল্লিক গোপালগঞ্জের অধিবাসী। ৪ বছর ধরে মোহাম্মদপুরে প্রশিকার উন্নয়নকর্মী হিসেবে কাজ করছেন। তিনি ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির মাঠকর্মী হিসেবে লোন দেয়া এবং কিস্তি তোলার কাজ করেন। সবমিলিয়ে বেতন পান ৫৬০০ টাকা।

মহানন্দা, গোপালগঞ্জ শশরীর উচ্চ বিদ্যালয় এবং শহীদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয় থেকে যথাক্রমে ১৯৯১ সালে এসএসসি ও ১৯৯৩ সালে এইচএসসি পাস করেন। গোপালগঞ্জের কালকীনি সৈয়দ আবুল হোসেন কলেজ থেকে বি.কম পাস করে ঢাকায় উচ্চশিক্ষার জন্য জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হন। ব্যবস্থাপনায় মাস্টার্স ডিগ্রি। মহানন্দার বাবা একজন কৃষি ছিলেন। কষ্ট করে ছেলেমেয়েদের পড়িয়েছেন। মহানন্দা ৫ ভাই ১ বোন। বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। বড়ভাই যিনি বাবা মারা যাবার পর পরিবারের হাল ধরেন। নিজে না পড়ে বিশেষ করে বাড়ির ছেলেদের পড়াশোনার দায়িত্ব নেন। তিনিও বর্তমানে বেঁচে নেই। মহানন্দা এখন পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সকল দায়িত্ব পালন করেন। বাড়তি আয়ের জন্য তিনি বাসায় টিউশনি করেন।

মহানন্দা বিয়ে করেছেন ২ বছর। তার স্ত্রী বর্তমানে ঘরের কাজই করেন। ১ বছর আগে তিনি কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে একটি প্রতিষ্ঠানে ৪ হাজার টাকা বেতনে কাজ করতেন। কিন্তু মহানন্দা যখন দেখলো তার একার আয় স্ত্রীর চেয়ে বেশি এবং স্ত্রী চাকরি করার ফলে ঘরের ব্যবস্থাপনার কাজ এলোমেলো হয়ে থাকে, তার নিজের ক,জের ক্ষতি হয়, তখন স্ত্রীকে মহানন্দা চাকরি ছেড়ে ঘরের কাজ এবং তাকে সহযোগিতা করার কথা বলে। ফলে তার স্ত্রী এখন গার্হস্থ্য ব্যবস্থাপনার সকল কাজ করে স্বামীকে সহযোগিতা এবং কাজের উৎসাহ দিচ্ছে।

পরিবারের টাকা-পয়সা কিভাবে খরচ হবে, কোন কোন খাতে কিংবা পারিবারিক কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে গেলে তারা দু'জনে মিলে আলাপ করেন বলে জানান উন্নয়ন কর্মী মহানন্দা। তবে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূলে তিনি নিজেই সবসময় থাকেন।

ছোটবেলা থেকেই নানারকম সমাজসেবামূলক তৎপরতায় যুক্ত থাকায় প্রশিকার কাজও তাকে উৎসাহী করে। তার মনে হয়, যেন দরিদ্র মানুষের কাছে থাকতে পারছেন। কিন্তু পরিশ্রম অনুযায়ী নিজের চাহিদা পূরণ হবার মতো পারিশ্রমিক না থাকায় ভবিষ্যতে চাকরি না করে শিক্ষকতা পেশা বা ব্যবসা করার ইচ্ছা পোষণ করেন তিনি।

সংগঠনের ভেতরে এখন নারীরা অনেক বেশি কাজ করছে এবং যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী এগিয়েও যাচ্ছে। নারীরা নেতৃত্ব দিচ্ছে– এটিকে একটি সমাজের ইতিবাচক অগ্রগতি বলে তিনি চিহ্নিত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৫

ফজিলা আক্তার লিলি
এরিয়া অফিসার
নাগরিক উদ্যোগ, কলিহাতি, টাঙ্গাইল

ফজিলা আক্তার নাগরিক উদ্যোগের টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি এরিয়া অফিসার। এই প্রতিষ্ঠানে তিনি চাকরি করছেন প্রায় ১০ বছর। নাগরিক উদ্যোগের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ফজিলা এই সংগঠনে কাজ করছেন। ১৮০০ টাকা বেতন দিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। আর এখন তার বেতন ৫২৫০ টাকা।

টাঙ্গাইল কালিহাতি ইউনিয়নের মেয়ে লিলি। পাবনার পাকশি স্কুল থেকে এসএসসি আর পাবলা কাগমারী ডিগ্রি কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন তিনি। তখন তার বাবা সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে পাবনাতেই ছিলেন। লিলিদের পরিবারের সবাই নানা সামাজিক, রাজনৈতিক কাজের সাথে যুক্ত থাকায় এ বাড়ির পরিবেশ অন্যরকম ছিল। লিলির মা এলাকায় সমিতি গঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। এ ধরনের পরিবেশের মধ্য দিয়ে বড় হবার কারণে লিলি সমাজ সচেতনতামূলক কাজে আগ্রহী ছিলেন বরাবরই। এইচএসসি পরীক্ষার পর থেকে তিনি নানা কাজে জড়িয়ে পড়েন, বিভিন্ন এনজিওতে কাজ করেন, স্কুলে মাস্টারির চাকরিও করেন। এরপর যোগ দেন। পরে '৯৯ সালে যুক্ত হন নাগরিক উদ্যোগে।

এক মেয়ে আছে লিলির। সাড়ে ৪ বছর বয়স। ফজিলা আক্তার লিলি নাগরিক উদ্যোগ, কালিহাতিতে কাজ করতে গিয়ে সকলেই তাকে চেনে। একে তো নিজের এলাকায়, এছাড়া লিলির কথাবার্তা, কাজের অভিজ্ঞতা-দক্ষতা সালিশে বসলেই বোঝা যায়।

লিলি তার কাজের অভিজ্ঞতা থেকে বলেন, "এনজিওরা এ দেশে অনেক কাজ করেছে। নেতৃত্ব তৈরি করেছে মেয়েদের মধ্যে। এনজিও ভালো কাজ করছে এবং এনজিও বাংলাদেশের প্রাণ"। এর কারণ চানতে চাইলে তিনি বলেন, "এনজিওরা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করছে। এমনভাবে কাজ করছে যাতে মানুষের উপকার হয়। এনজিওরা না থাকলে মানুষের মধ্যে মারামারি, হানাহানি চলতো।"

লিলি আরো জানান, নাগরিক উদ্যোগ কাজের পরিবেশ তাকে অনুপ্রাণিত করে। সে এখন নিজে আয় করে। কিভাবে খরচ করবে তার সিদ্ধান্ত নিজেই নেয়। তার স্বামী তার আয়-রোজগার বা খরচের বিষয়ে অপ্রয়োজনীয়ভাবে নাক গলায় না। এ কারণে সে নিজের মতো আছে।

৬

পিয়ারজান
সদস্য, ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি, ব্র্যাক
তকিপুর, রাজশাহী

পবা থানার নিকটবর্তী অঞ্চল তকিপুর। এই গ্রামেই থাকেন পিয়ারজান। এখন ঘর-সংসার, স্বামী-সন্তান সকলের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন মধ্যবয়স্ক পিয়ারজান। নিজের বয়স কত একথা পরিষ্কার করে বলতে পারে না সে, যেমন গ্রামের অধিকাংশরাই পারেন না। আনুমানিক ৩৫ বছর বয়স্ক এই নারীর স্বামী রিয়াজউদ্দীনের কঠিন রোগ কাজ-কারবার করার মতো শারীরিক অবস্থায় আর নেই।

রিয়াজউদ্দিন দীর্ঘদিন রোগাক্রান্ত থাকায় ঘর-সংসারের সকল দায়িত্ব এখন পিয়ারজানের। ২ ছেলে ২ মেয়ের সংসার পিয়ারজানের। পিঠাপিঠি ২ ছেলে। একজন স্কুলে যায়, অন্যজন এখনো ছোট। দুই মেয়ে, একজন পঞ্চম শ্রেণীতে অন্যজন নবম শ্রেণীতে পড়ছে।

১৯৯৪ সাল থেকে প্রায় ১১ বছর ধরে পিয়ারজান ব্র্যাকে 'তকিপুর শ্রমজীবী মহিলা সমিতি'র সদস্য। এর আগে স্বামী সুস্থ কর্মক্ষম থাকা অবস্থায় ঘরসংসারের দেখভাল করাই ছিল কাজ। স্বামীর কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হওয়ায়

Dhaka University Institutional Repository

গত্যন্তর না দেখে অন্যের বাড়িতে ধান আর দুইবেলা খাবার বিনিময়ে গতরখাটুনি খেটে কোনোমতে ছেলেমেয়ে, স্বামী নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা চালায়। এই দুঃখের সময় তকিপুরে ব্র্যাকের কাজ শুরু হলে পিয়ারজান সদস্য হয়। একদিকে ঋণ তোলে অন্যদিকে জমা দেয়। কিন্তু এই ঋণের টাকায় পিয়ারজানের সংসার চলে না। সন্তান, অসুস্থ স্বামীসহ জীবন নির্বাহ কঠিন হয়ে পড়ায় কেবল অন্যের বাড়িতে কাজ করার মধ্যে থেমে থাকে না সে।

মাথায় নতুন বুদ্ধি আসে। পিয়ারজান ঋণের অর্ধেক দিয়ে সংসার চালায় আর বাকি অর্ধেক দিয়ে সুদের ব্যবসা করে ঋণ পরিশোধ করে। গত ৪ বছরে পালাক্রমে ১০, ১২, ১৫ ও ১৭ হাজার টাকার ঋণ তুলেছে সে। তার এখন সঞ্চয় আছে ৭ হাজার ৬শ' ২৪ টাকা।

ব্র্যাক থেকে ঋণ নিয়ে তার জীবনের চাকা নতুনভাবে ঘুরতে শুরু করেছে। দারিদ্র্যের কষাঘাতে ব্র্যাক থেকে ঋণ নিয়ে নিজেই নতুনভাবে সুদের ব্যবসা শুরু করেছে। কোনো ব্যবসায় টাকা না খাটিয়ে এভাবে ঋণের চক্রে নিজেকে কেন জড়ালেন তিনি? 'ঘরে কাজ করার লোক নাই, বাঁচার জন্য সমিতি করি। গরিবরাই সমিতি করে। বড় লোক নেয় বড় লোন আর গরিবরা নেয় ছোট লোন'– এভাবেই বলেন পিয়ারজান।

এভাবেই কাটছে পিয়ারজানের জীবন। স্বামী যদি একটু সুস্থ থাকতো তাহলে তাকে আর পরিশ্রম করতে হতে না। 'স্বামী যখন সুস্থ ছিল, আয়-রোজগার সব তিনি করতেন। ঘরের সব সিদ্ধান্ত তিনি দিতেন। এত কষ্ট ছিল না। এখন পরিশ্রম বেশি হয়। নিজেকে সবদিক থেকে খেয়াল রাখতে হয়।' কিন্তু পিয়ারজানের আর কী বা করার আছে। সে কাজ না করলে পুরো সংসারই অচল হয়ে যেত।

৭

মর্জিনা
নাগরিক উদ্যোগ
আকচারাণ, কালিহাতি, টাঙ্গাইল

মর্জিনা কালিহাতি থেকে ৯ মাইল দূরে সমজানি গ্রামের মেয়ে। মর্জিনার বয়স ১৭। বিয়ে হয়েছে ১৩ বছর বয়সে। মর্জিনার বাবা ছিলেন ঘাটের মাঝি। মর্জিনার মা রাজি না থাকলেও অল্প বয়সে মেয়েকে বিয়ে দেয় বাবা। শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সাথে শর্ত হয়, বিয়ের ২ বছর পর যখন মর্জিনা আরেকটু বড় হবে, সবকিছুকে মানিয়ে নিতে শিখবে তখন তাকে স্বামীর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু ৩ মাসের মাথায় তাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো হয়। ছোট্ট মর্জিনা শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে অসহায় বোধ করতে শুরু করে। মর্জিনার বাবার জমিজমা কিছুই নেই, শুধু বসতভিটা ছাড়া। তবু বিয়ের সময় মেয়েকে ১ ভরি স্বর্ণের গহনা দিয়েছে। জামাইকে ১০ হাজার টাকাও দিয়েছে।

মর্জিনার স্বামী মোতালেব কাপড় বোনে। বিয়ের কিছুদিন পর শ্বশুরবাড়ির পাশে ২ কাঠার মতো ছোট্ট একটা জায়গায় মর্জিনার বাবার সহযোগিতায় এবং ঋণ নিয়ে তারা ঘর তোলে। মর্জিনা প্রথমে ব্র্যাক তারপর আশা ও গ্রামীণ ব্যাংক থেকে মোট ২৬ হাজার টাকা ঋণ নেয়। আর তার বাবার কিছু টাকা, সবমিলিয়ে বাড়ি তুলে থাকতে শুরু করে আকচারাণে।

এরকম অবস্থায় মর্জিনার স্বামী নাগরিক উদ্যোগে স্ত্রী এবং তার পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে জানায়, শ্বশুরবাড়ির এলাকায় থাকে তাই যখন তখন শ্বশুর তার ওপর অত্যাচার করে। সুযোগ পেলে ঘরে তালা দেয়। গালিগালাজ করে এমনকি গায়ে হাতও তোলে। সে আকচারাণ ছেড়ে বাপের বাড়ি যাবে বউকে নিয়ে। তা না হলে আর সংসার করবে না। ওদিকে মর্জিনাও পাল্টা জবাব দেয়, আকচারাণ ছেড়ে যাবে না। বহু কষ্টে জমি নিয়েছে, ঘর তুলেছে, কিস্তি শোধ করেছে। এখন আর এ জায়গা ছাড়বে না। স্বামী যদি এখানে থাকে তাহলে সংসার করবে। এ ধরনের অবস্থায় নাগরিক উদ্যোগ তার সালিশি ও আইনি সহায়তা কমিটিসহ সালিশে বসে। এবং সিদ্ধান্ত হয় মর্জিনা-মোতালেব একসাথে আকচারাণে সংসার করবে। তাদের পারিবারিক বিষয়ে শ্বশুরবাড়ির লোকজন প্রবেশ করবে না। যদি করে তাহলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। এরপর এখন মর্জিনা-মোতালেব নিজেদের মতো ছোট্ট মেয়ে নিয়ে সংসার করছে।

Dhaka University Institutional Repository

রওশন আরা
সদস্য, ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি, ব্র্যাক
কুমড়াপুকুর,পবা, রাজশাহী

রাজশাহীর পবা থানার কুমড়াপুকুরের রওশন আরা এখন হাই স্কুলের একজন আয়া। দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্ম নিয়ে ৩ বেলা যেখানে খাবার জোটেনি সেখানে সব ছাপিয়ে স্কুলে যাবার সুযোগ ছিল না রওশনের। যখন তার স্কুলের বই হাতে থাকার কথা, যখন স্কুলের মাঠে খেলা-ধূলা করার কথা তখন রওশন আরা ঘরে মায়ের সাথে নানা কাজ করতো। রান্নার কাজে সাহায্য করা, কখনো রান্না করা, ছোট ভাই বোনদের দেখাশোনা করা এই ছিল নিত্য দিনের কাজ। রওশন আরার মতো শ্রমজীবির সন্তানরা জীবনের এই অত্যাধিক চাপকে স্বাভাবিক হিসেবেই মেনে নিয়েছে। 'ভাগ্যই এখানে এনেছে। আল্লাহ আমাদের গরিব হালে বানিয়েছে। আমাদের তো হাত নাই; এভাবেই আমাদের থাকতে হবে। আমরা মহিলা মানুষ বেশি বলার নেই।'

এই রওশন আরার ছোট বেলার বিদ্যালয় যাবার স্বপ্ন পূরণ না হলেও শেষ পর্যন্ত তাকে মাঝ বয়সে বিদ্যালয়ে পা দিতে হলো আয়ার চাকরী নিয়ে।

২ ছেলে আর ২ মেয়ে নিয়ে রওশনের সংসার। খুব অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল রওশনের। স্বামী ছিল একজন রিকশাচালক। কিন্তু ৪ সন্তানের জন্মের পর পরই স্বামী তাকে তালাক দিয়ে আবারও বিয়ে করে। স্বামী পরিত্যক্ত অবস্থায় সে হিমশিম পরিস্থিতিতে পড়ে। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে জীবন চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। দুঃখের কথা বলতে গিয়ে রওশন বলে ওঠে -' কষ্টের কথা কী বলবো? এ জীবনে হেভী পরিশ্রম করেছি। যে বছর স্বামী আমাকে ছেড়ে দিল সে বছর কষ্ট করতে হয়েছে অনেক। হাতের কাছে যে কাজ পেয়েছি তাই করেছি। মুড়ি বিক্রি, বাদাম বিক্রি থেকে শুরু করে অন্যের বাড়ীতে কাজ করা কোনটাই বাদ পড়েনি। নিজে কষ্ট করে ছেলে মেয়েকে খুশী করেছি। বাচ্চারা যাতে বাবার দুঃখ না করে তাই জন্য কষ্ট করেছি।'

রওশনের ছেলেমেয়েরা এখন কিছুটা বড় হয়েছে বড় ছেলের বয়স এখন ১৮ বছর, সে মুদি দোকান করে আর ছোটো ছেলের বয়স ১৪ সে মোটর পার্সের দোকানে কাজ করে। ছোট দুই মেয়ে একজন ৭ম আর একজন ২য় শ্রেণীতে পড়ে। ছেলেরা এখন মার চাপ কমাতে কাজ করা শুরু করেছে। বড় মেয়েরও শিগগিরই বিয়ে দেয়ার চিন্তা আছে।

২০০৩ সালে রওশন যুক্ত হয় ঋণ কর্মসূচির সাথে। একার টাকা আর ছেলেদের অল্প আয়ে সংসার চলা কঠিন হওয়ায় অন্যের কাছ থেকে ধার না করে ব্র্যাকের শরনাপন্ন হয় সে। গত ৩ বছরে রওশন ৪-৬-৭ হাজার হারে ঋণ নিয়ে ছেলের দোকানে এবং ঘর তোলার কাজে খাটিয়েছে।

ঋণ কর্মসূচি আর ব্র্যাকের সদস্য হয়ে রওশন আগের চেয়ে বুদ্ধিমান হয়েছে। ছেলেরা তার কদর করে। আগের মতো অন্ধকারে নেই সে। দেশের প্রধানমন্ত্রীর নাম বলতে না পারলেও এলাকার চেয়্যারম্যান মেম্বর এর নাম বলতে পারে। আগের চেয়ে টাকার হিসেবটা ভাল বোঝে। প্রতি সপ্তাহে সামাজিক সচেতনতামূলক ১৮টি প্রতিজ্ঞানামার প্রভাব কতটুকু বলা মুশকিল। এখন থেকেই সেভাবে মেয়ের বিয়ের যৌতুক কোথা থেকে জোগাড় করবে। তার দূর্ভাবনা আগের চেয়ে কমেছে, সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেয়েদের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত সমিতির সদস্য থাকবে। 'জামাইতো মেয়েকে খালি মুখে নেবে না' এভাবনা তার মাথা থেকে দূর হবার জো নেই।

মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেলে আর ঋণ নেবেন না তিনি। ঋণ নেবার পর ঘরে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য আসলেও ঋণের বোঝার চিন্তা তাড়া করে বেড়ায়। সপ্তাহন্তর কিস্তি পরিশোধ করতে গিয়ে লাভের পরিমাণ কতটাই বা থাকে। রওশন আরা বলেন ' ঋণ থেকে মুক্তি নাই, যার ঋণ নাই সেই মুক্ত।' এরপর যখন ছেলেরা চারদিক থেকে আয় করবে তখন আর কিস্তিতে থাকতে হবে না এভাবেই মত প্রকাশ করে রওশন।

Dhaka University Institutional Repository

৯

রিতা আক্তার
সদস্য, ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি, ব্র্যাক
শিক্ষক, মুন্সিহাট, কামরাঙ্গীরচর

কামরাঙ্গীরচরের আমিনবাগে রিতা আক্তারের বাড়ি। আজিমপুরের গার্হস্থ্য ও অর্থনীতি কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করে। আগ্রহ ছিল গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজেই টেক্সটাইল বিষয়ে অনার্স পড়ার। নানা অসুবিধায় সেটা না হওয়ায় পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ হারান। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে রিতার বাবা একজন ছোট ব্যবসায়ী। ছোট্ট মুদির দোকানে পাইপ বিক্রি করেন তিনি। এটা তার নতুন ব্যবসা। আগে তিনি কুটির শিল্পের কাজ করতেন। কাঠ দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করতেন নকশা করে। এই ব্যবসা বাব-দাদাদের আমলের হলেও রিতারা তা আর চালাতে পারেনি। শ্রমিকদের কাজে যে পরিমাণ মজুরি দেয়া দরকার সেটা তাদের পক্ষে দেয়া সম্ভব ছিল না। কুটির শিল্পের ক্ষুদ্র ব্যবসা ছেড়ে এখন বাবার দোকানের টাকা আর ভাইদের সহযোগিতায় কোন মতে ৪ বোন, ২ ভাইয়ের সংসার চলে। বড়ভাইকে অনেক কষ্ট আর খরচ করে সৌদি আরবে পাঠানো হয়েছিল। ভাই আর বাবার আয়েই তাদের সংসার চলে।

এইচএসসি পাশ করার পর প্রায় ১ বছর বসে থাকে সে। এরপর রিতা তার চাচাতো বোনের কাছে জানতে পারে ব্র্যাক স্কুলের কথা। এখানে এলে কিছু আয় হবে। তাই দিয়ে নিজের মতো কিছু একটা করতে পারবে, পরিবারের ওপর চাপ কমবে– এসব ভেবেই চাকরিতে যোগ দেয় রিতা। ব্র্যাকের কর্মীরা ওই সময় মুন্সিহাটির ঐ স্কুলটির জন্য একজন শিক্ষক খুঁজছিল। রিতাকে দিয়েই তাদের মুন্সিহাটি-৮ এর দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয় চালু হয়। ৮২৫ টাকা বেতনে রিতা কাজ শুরু করে।

বেতনের টাকা কিভাবে খরচ করেন– এ কথা জানতে চাইলে রিতা জানান, 'পরিবারকে সহায়তা করতে হয় না, এ কারণে বেতনে সামান্য যা কিছু টাকা পাই তা দিয়ে নিজের যা শখ হয় সেগুলো করার চেষ্টা করি।' রিতার মোবাইল আছে। ভাই কিনে দিয়েছে। বেতনের টাকা দিয়ে ফোনকার্ড এবং পোশাক বানানো এ দুটোই করে।

পড়াশোনা না চালিয়ে কেন এ পেশায় জড়ালেন– এর উত্তরে তিনি বলেন, 'পড়াশোনার ধারাবাহিকতায় একবার ছেদ পড়ায় ইচ্ছে হয়নি। আর শিক্ষকতা পেশা সম্মানের। ঝুঁকি কম এ কারণে এ পেশায় আছি।' রিতার শিক্ষকতা পেশায় আগ্রহ থাকলেও তিনি জানান, বিয়ের পর স্বামী না চাইলে তিনি কোনো কাজ করবেন না।

১০

পারভীন আক্তার
সদস্য, ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি, ব্র্যাক
শিক্ষক, উত্তর হাসাননগর, কামরাঙ্গীরচর

৫ বছর বয়সে বাবা-মা দুজনকে হারিয়ে অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে এখন পারভীন ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষক। বাবা-মার একমাত্র সন্তান অল্প বয়সে বাবা-মাকে হারিয়ে চাচার কাছে ছিল কিছুদিন। চাচাও বেশি দিন রাখতে চায়নি। পাঠিয়ে দেয় জয়দেবপুর কানাডিয়ান সংস্থা ফ্যামিলিজ চিলড্রেনে। এখান থেকে বড় হয় সে। পড়াশোনা করে সংস্থার নিজস্ব স্কুলে। ৮ম শ্রেণী পাশ করার পর টেপারিবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১ম বিভাগে এসএসসি পাশ করে। পরবর্তীতে পড়ার আগ্রহ থাকলে কানাডিয়ান সংস্থার শর্ত ছিল এইচএসসি খরচ তারাই দিবে, যদি সে কোনো কলেজে ১ম-৩য় স্থানের মধ্যে থাকতে পারে। এই শর্তের মধ্যে নিশ্চয়তা না থাকায় সংস্থার দেয়া চাকরি করেন তিনি।

এরপরে তিনি যুক্ত হন ব্র্যাক স্কুলে। স্কুলে ঢোকার আগেই তিনি বিয়ে করেন। ৭ বছরের সংসারে ১ ছেলে আছে। স্বামী মার্কেটে দোকানদারি করে। স্বামীর আরেক স্ত্রী আছে। ওই স্ত্রী পারভীনের বিয়ের আগেই ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

পারভীন বিয়ের পর জানতে পারে। সব জেনেও নিরূপায় হয়ে স্বামীর সংসার করে। স্বামীর প্রথম স্ত্রী তখন আলাদা থাকতো। গতবছর প্রথম স্ত্রী ফিরে আসায় পারভীন স্বামীর সাথে আর থাকে না। একই বাড়িতে আলাদা থাকে, আলাদা খায়। 'ছোটবেলা থেকে কষ্টের জীবন, অন্যের বাড়িতে বড় হয়েছি, সংস্থায় থেকেছি। অনেক কষ্ট হয়েছে। এখন স্বামীর সংসারেও সুখ নেই।' বলেন পারভীন।

ব্র্যাক স্কুলে ৯৭৫ টাকার বেতনের চাকরিতে জীবন না চললেও তার স্বস্তি তৈরি হয়েছে। নিজের মতো ছেলের জন্য খরচ করতে পারে। টাকা কিভাবে খরচ করবেন এখন তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত নেন।

১১

শাহনাজ
কমিউনিটি মবিলাইজার
নাগরিক উদ্যোগ, কালিহাতি, টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইল সালেঙ্কা অঞ্চলের মেয়ে শাহনাজ। ১৯৯৭-এ কালিহাতি কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করে ভর্তি হয় ডিগ্রি কলেজে। শাহনাজের বাবা সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন। '৯৬-এ তিনি চাকরি ছেড়ে প্রথমে সিঙ্গাপুর ও পরে ইটালিতে যান। শাহনাজরা ২ ভাই ১ বোন। ১ ভাই পুলিশে চাকরি করে, অন্য ভাই দশম শ্রেণীর ছাত্র।

শাহনাজের বাবা যখন বিদেশে চাকরি করার জন্য দেশ ছাড়ছিল তখনই পরিবারের অন্য সবাই চিন্তা করতে শুরু করে অবিবাহিত মেয়েকে এভাবে ফেলে রাখা ঠিক হবে কিনা? কে দেখবে? তখন ভাইও খুব বড় না। এসব ভাবনা থেকে শাহনাজের বাবা ঠিক করে বিয়ে দিয়ে তারপর বিদেশ যাবে। ভাবনা অনুযায়ী শাহনাজের বিয়ে হয়।

শাহনাজের বিয়ে হয়েছে প্রায় ৮ বছর হলো। স্বামী ব্যবসা করেন। আয়-রোজগার ভালোই। বিয়ের পর থেকেই শাহনাজ পরিবার পরিকল্পনার জন্য 'বড়ি' খাচ্ছে। তাদের একটা ৩ বছরের মেয়ে আছে। ঘরে সারাদিন তেমন কোনো কাজ থাকে না। এজন্য সে নাগরিক উদ্যোগের চাকরির খবর পেয়ে যোগ দেয়। তার বেতন ১৮৫০ টাকা। শাহনাজ জানায়, তার চাকরিতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ শ্বশুরবাড়ির মেয়েরাও চাকরি করে। স্বামীও চায় অবসর সময়টা কাজে লাগুক, তাই চাকরি করছে। এখানে অন্যান্য এনজিও কাজ করে। যাদের কাজ লোন দেয়া, কিস্তি তোলা। ওসব কাজ শাহনাজের স্বামী পছন্দ করেন না। সালিশের কাজ বলেই শাহনাজের স্বামী চাকরি করতে দিয়েছে।

শাহনাজ জানায়, তার স্বামীর পছন্দ-অপছন্দের কথা। পর্দাও তার স্বামীর পছন্দ। তার নিজেরও মনে হয়, পর্দার মধ্যেই কাজ করা উচিত। এজন্য শাহনাজ বোরখা পরেই বিভিন্ন এলাকায় কাজ করতে যায়। এখানে কাজের পরিবেশ অনেক স্বস্তিকর বলেন তিনি।

১২

কামরুন্নাহার লাকী
শিক্ষক, উত্তর হাসাননগর
ব্র্যাক

লাকীর ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন ছিল ডাক্তার হবার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারিবারিক অস্বচ্ছলতার কারণে তার ইচ্ছা তো পূরণ হয়ইনি, তাকে লেখাপড়াই ছেড়ে দিতে হয়েছে। হাসাননগর থেকে ১ কিলোমিটার দূরে মা, ভাইবোনকে সাথে নিয়ে থাকে লাকী। বাড়ির বড় মেয়ে সে। তার ছোট ১ বোন ও ৩ ভাই। আরেক বোনও তার মতো ব্র্যাক স্কুলে চাকরি করে। তাদের পরিবারে ২ বোন ছাড়া আরেক ভাইও আয় করে। ফ্যাক্টরিতে চাকরি করে সে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৩ সালে আজিমপুর গার্লস স্কুল থেকে পাশ করে লাকী। ছোটবেলায় তার চিন্তাতেই আসেনি জীবনে এত কষ্ট করে টিকে থাকতে হয়। অনেক বড় স্বপ্ন ছিল তার। এসএসসির পর ড. শহীদুল্লাহ কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষাও দেয়। কিন্তু পারিবারিক সমস্যার কারণে পাশ করতে পারেনি। পারিবারিক অবস্থা এমন ছিল যে, চাইলে প্রয়োজনীয় বিষয়, যেগুলোতে সে দুর্বল, সেগুলোতে মাস্টার রেখে পড়ার মতো সামর্থ্য তার ছিল না। নিজের মতো করে পড়ে খুব একটা পেরে ওঠে না। ফলাফল খারাপ হওয়ায় কিছুটা হতাশ হলেও ব্যক্তিগতভাবে লাকীর পড়ার বিষয়ে আগ্রহের কমতি ছিল না। কিন্তু আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে পরিবার থেকেও পড়ার বিষয়ে কোনো আগ্রহ ছিল না। পরবর্তীতে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা দেয়ার কথা ঠিক করে। কিন্তু সেখানেও সম্ভব হয় না। এবার ফাঁড়া হিসেবে সামনে আসে অসুস্থতা, হিমোরাইজিন রোগে আক্রান্ত হওয়ায় হাত-পা ব্যথা, অসুস্থতা লেগে থাকায় এখানেও পড়ার ছেদ পড়ে।

লাকী প্রায় ৪ বছর ধরে এ স্কুলে চাকরি করছেন। বেতন পান ৯৭৫ টাকা। বাবা বেঁচে থাকতে সে তার বেতন দিয়ে নিজ খরচ চালাতো। নিজ ইচ্ছেমতো ড্রেস, কসমেটিকস কিনতেন। অন্য কাউকে কিছু দিতে ইচ্ছে হলে দিতেন। কিন্তু বাবা মারা যাবার পর থেকে পুরো টাকাই তুলে দেন মার কাছে। ব্র্যাকে সাড়ে ৪ ঘণ্টার স্কুল আর এত অল্প বেতনে লাকীর জীবনও ক্লান্তিকর। ভোর ৬টায় ঘুম থেকে উঠে মাকে কাজে সহযোগিতা করে নিজের কাজগুলো সেরে স্কুল শুরুর আধ ঘণ্টা আগে পৌঁছতে হয়। বাড়ি ফিরে খাতা দেখা, পাঠটীকা লেখার কাজও থাকে।

চাকরিতে যুক্ত হয়ে পরিবারকে কিছুটা সাহায্য করতে পারছে লাকী। এতে লাকী কিছুটা হলেও স্বস্তি পায়। সামাজিক নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যেই মেয়েরা এগুলোকে অতিক্রম করে হাল ধরছে, এগুচ্ছে। কিন্তু এই পথও খুব সহজ না বলেন লাকী। চারপাশে নানা ঘটনা, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে সাধারণ মানুষরা ভয় পায়। মেয়েরা আরো পায়। তিনি বলেন, "মেয়ে মানুষের বেশি বললে সমস্যা। তাই প্রতিবাদ বুঝে শুনে করতে হয়। বেশি বললে পরে সাক্ষীকে নিয়ে টানাটানি হবে। তাই যেখানে দেখি নিজের সমস্যা হবে না সেখানে বলি, অন্য জায়গায় চুপ থাকি।"

১৩

জোসনা আক্তার
সদস্য, ক্ষুদ্র ঋণ, প্রশিকা
মোহাম্মদপুর, ঢাকা

জোসনা আক্তার '৯২ সাল থেকে প্রশিকার ঋদ্র ঋণের সদস্য। মা-বাবার সাথে আগারগাঁও বস্তিতে থাকতেন। বিয়ের পর ওই এলাকায় ছিলেন দীর্ঘদিন। তার মাও প্রথম থেকে প্রশিকায় ঋণ কর্মসূচির সদস্য ছিলেন। জোসনার বিয়ে হয় সরকারি চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নজরুল ইসলামের সাথে, ২০ বছর আগে। এখন তারা সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের পাশে কোয়ার্টারে থাকেন। তাদের নিজেদের জায়গা-জমি নেই। সম্প্রতি ৩০ শতাংশ জায়গা কিনেছে শ্বশুরের নামে।

জোসনা গত ৫ বছর ধরে কাপড়ের ব্যবসা করছেন। গত ৩ বছর যথাক্রমে ২০, ১০ ও ১৫ হাজার টাকা নিয়ে কাপড়ের ব্যবসায় খাটিয়েছেন। সপ্তাহ শেষে কিস্তি পরিশোধ করেন। সূর্য শিখা সমিতির ক্যাশিয়ার তিনি। নিজেরসহ অন্যদের টাকারও হিসাব রাখেন। সমিতির কোনো একজন সদস্য কিস্তি পরিশোধ করতে না পারলে অনেক সময় তিনি পরিশোধ করে দেন। কারণ, মাঠকর্মীরা সার্বক্ষণিকভাবে তাদের চাপে রাখেন।

শাড়ির ব্যবসার সাথে সাথে ঘরের সব কাজ তিনি করেন। ছেলেমেয়ে, সংসার সবকিছুর দেখে রাখার দায়িত্ব তারই। ঘরসংসার দেখা আর শাড়ির ব্যবসা করে তেমন কোনো অবসরই তার হাতে থাকে না। যেটুকুর অবসর থাকে তাতে ঘরে বসে জামা-কাপড় সেলাই করেন। টিভি দেখেন অথবা আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে যান। নিজে আয় করেন বলে নিজের মতো করে খরচ করা সম্ভব হচ্ছে তার পক্ষে। তার আয়ের বড় অংশ পরিবারের স্বচ্ছলতার কাজে খরচ হয়। বাকি টাকায় সে সংসারে নিজের ইচ্ছানুযায়ী খরচ করে। আগারওগাঁও বস্তি যখন সরকার উচ্ছেদ করেছিল সে সময় জোসনা ও তার পরিবারের সদস্যরা জোরালো প্রতিবাদ করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্নমালা

ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতা ও অতিদরিদ্র কর্মসূচির অংশগ্রহণকারীদের তথ্য

০১. উত্তরদাতার নিজের সম্পর্কে তথ্য

নাম	বয়স	লিঙ্গ	বৈবাহিক অবস্থা	ধর্ম	পেশা		আয়	শিক্ষা
					প্রধান	অপ্রধান		

০২. পরিবারের অন্যান্য সদস্যের তথ্য

ক্রমিক নং	নাম	সদস্যের সাথে সম্পর্ক	লিঙ্গ	বয়স	পেশা		শিক্ষা	আয়	বৈবাহিক অবস্থা
					প্রধান	অপ্রধান			

ক্ষুদ্র ঋণ ও অতিদরিদ্র কর্মসূচি প্রসঙ্গে

০৩. কোন খাত থেকে ঋণ নিয়েছেন?

০৪. কোন খাতে ব্যবহার করেছেন– কৃষি/গবাদি/ছোট ব্যবসা/বাড়ি নির্মাণ?

০৫. কত বছর ধরে ঋণ নিচ্ছেন?

০৬. সাপ্তাহিক সুদের পরিমাণ কত?

০৭. সুদ সময়মতো পরিশোধ না করলে কী হয়?

Dhaka University Institutional Repository

সম্পদের মালিকানা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রসঙ্গে

০৮. নিজের নামে জমি আছে কি না– হ্যাঁ/না?
০৯. থাকলে পরিমাণ কতো?
১০. পরিবারের অন্যান্য কোনো সদস্যের নামে জমি আছে কিনা?
১১. নিজে ও পরিরারের অন্যান্য সদস্যের কি কি সম্পত্তি আছে?
১২. পরিবারের মোট আয় কতো?
১৩. ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবহারকারী কে– নিজে/দু'জনে/ছেলে/স্বামী?
১৪. আর্থিক ও অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কে– নিজে/স্বামী/দু'জনে?

গার্হস্থ্য কর্ম ও শিশু পালন প্রসঙ্গে

১৫. রান্নার দায়িত্ব পালনকারী কে– নিজে/মেয়ে/ছেলের বউ/ছেলে/স্বামী/অন্যান্য/দু'জনে?
১৬. শিশু পালনে দায়িত্ব পালন করে কে– নিজে/স্বামী/দু'জনে/মেয়ে/ছেলের বউ/শাশুড়ি?
১৭. বাজার করার দায়িত্ব কার– নিজে/স্বামী/ছেলে/স্বামী ও ছেলে/অন্যান্য?
১৮. খাবারের মেন্যু নির্দিষ্ট হয় কার পছন্দে– নিজে/স্বামী/ছেলে/স্বামী ও ছেলে/অন্যান্য?

পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রসঙ্গে

১৯. পরিবারের সকলে স্বাস্থ্যসেবা সমানভাবে পান কিনা?
২০. নারীদের স্বাস্থ্যের অবস্থা কী– ভালো/মোটামুটি/খারাপ?
২১. ছেলে-মেয়ের চিকিৎসার খরচ চালাতে সক্ষম কিনা– হ্যাঁ/না/মোটামুটি?
২২. পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি কে গ্রহণ করে– নিজে/স্বামী?
২৩. কি পদ্ধতি গ্রহণ করেন– পিল/নরপ্ল্যান্ট/লাইগেশন/কনডম?
২৪. কয়বেলা খাদ্য গ্রহণ করে বর্তমানে ও পূর্বে– একবেলা/দু'বেলা/তিনবেলা?
২৫. মাছ, মাংস, ডিম, দুধ কেনার সামর্থ্য আছে কিনা– হ্যাঁ/না?
২৬. যদি থাকে তাহলে মাসে ক'দিন পর পর খান?
২৭. পরিবারের ভালো কিছু রান্না হলে কার জন্য ভালো অংশ তুলে রাখা হয়– মেয়ে/ছেলে/স্বামী/শাশুড়ি/বউ/অন্যান্য?

সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা প্রসঙ্গে

২৮. মৌলিক অধিকার কি জানেন কিনা– হ্যাঁ/না?
২৯. রাষ্ট্রের অধিকার সম্পর্কে কতটুকু অবগত আছেন– হ্যাঁ/না?
৩০. মেম্বার বা চেয়ারম্যানের নাম জানেন কি না– হ্যাঁ/না?
৩১. প্রধানমন্ত্রীর নাম জানেন কিনা– হ্যাঁ/না?
৩২. অন্যায়/দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন– হ্যাঁ/না?
৩৩. বিবাহ আইন সম্পর্কে জানেন কি না– হ্যাঁ/না?
৩৪. তালাক আইন সম্পর্কে জানেন কি না– হ্যাঁ/না?
৩৫. উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে জানেন কি না– হ্যাঁ/না?
৩৬. পর্দার ব্যবহার সম্পর্কে মতামত কি– হ্যাঁ/না/মাধ্যম?
৩৭. যৌতুক দেন কি না– হ্যাঁ/না?
৩৮. দিলে কি দেন– জমি/টাকা এবং স্বর্ণ/টাকা?
৩৯. অন্যের ওপর নির্ভরতা কমেছে কিনা? কমলে কি মাত্রায়?
৪০. উন্নতি বলতে কি বোঝেন?
৪১. দারিদ্র্য দূর হবে কিভাবে?

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসনে নারী-পুরুষ কর্মীদের জন্য প্রশ্নমালা

৪২. উত্তরদাতা সম্পর্কে তথ্য

নাম	লিঙ্গ	বৈবাহিক অবস্থা	স্বামী/স্ত্রীর পেশা	শিক্ষাগত অবস্থা	কর্মকাল	আয়	পদোন্নতি	পদত্তর	শ্রমঘন্টা

৪৩. পরিবারের অন্যান্য সদস্যের তথ্য

নাম	বয়স	সম্পর্ক	বৈবাহিক অবস্থা	শিক্ষাগত অবস্থা	পেশা	বেতন

৪৪. প্রশাসনিক পরিবেশে নারী-পুরুষের সম্পর্ক কেমন?
৪৫. সহকর্মীরা পরস্পরকে লিঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে দেখেন কিনা– হ্যাঁ/না?
৪৬. নীতিনির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন কি না? করলে তার মাত্রা কেমন?
৪৭. পদোন্নতি হয়েছে কিনা? হলে এর মানদণ্ডগুলো কি কি?
৪৮. মাঠপর্যায়ে কাজের হিসেবে বেতন নির্ধারণ করা উচিৎ কি না– হ্যাঁ/না?
৪৯. জেন্ডার পলিসি কার্যকর আছে কি না– হ্যাঁ/না?
৫০. তালাক, মোহরানা, পর্দা, উত্তরাধিকার সম্পর্কে ভাবনা কি?
৫১. পরিবারের মোট আয় কতো?
৫২. বেতনের টাকা খরচ করেন কিভাবে?
৫৩. কি ধরনের পেশায় যুক্ত হবার আগ্রহ ছিল?
৫৪. আগ্রহ অনুযায়ী পেশা পেয়েছেন কি না– হ্যাঁ/না?
৫৫. স্বামীর স্বচ্ছলতা থাকলে বিয়ের পর চাকরি করবেন কিনা– হ্যাঁ/না? (অবিবাহিতদের ক্ষেত্রে)
৫৬. পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন কে– নিজে/স্বামী/অন্যান্য?
৫৭. পরিবারে গার্হস্থ্য কর্মে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ কেমন আছে? কেমন হওয়া উচিত?
৫৮. সংসার দেখা ও শিশু পালনের দায়িত্ব কার বলে মনে করেন– নিজে/স্বামী/অন্যান্য?

এনজিওত্রয়ের এনজিও কাঠামো সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎকারের প্রশ্ন

৫৯. মেয়েরা এখন পেশায় বেশি যুক্ত হচ্ছে এর কারণ কী মেয়েদের চিন্তার অচলায়তন ভাঙছে? না কি অন্য কিছু?
৫৯. রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে নারীদের গুরুত্ব দেয়ার কথা বলা হচ্ছে এনজিও মহলে। এর কারণ কি? এনজিওরা 'নারীবান্ধব' বা 'নারী সংবেদনশীল' বলেই করছে?

Dhaka University Institutional Repository

৬০. প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ে নারীদের অবস্থান নেই কেন? মেয়েদের পদোন্নতি আগে হয় না ছেলেদের? যদি ছেলেদের হয় তাহলে মেয়েদের না হওয়ার পেছনের কারণগুলো কী?

৬১. মেয়েরা কী বেশিরভাগ সময় পেশাকে ক্যারিয়ার হিসেবে নেয় না? কী মনে হয়?

৬২. 'নারী' ও 'পুরুষ' সমান নয় অর্থাৎ একই কাজ উভয়েই সমানভাবে করতে পারবে এমন নয়? কিছু দায়িত্ব নারীদের জন্য নির্দিষ্ট, কিছু পুরুষদের জন্য– এ বিষয়গুলো মাথায় রেখে ইক্যুইটির কথা বলা দরকার। এ বিষয়ে আপনার মতামত?

৬৩. ক্ষমতায়ন প্রশ্নকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করেন? এর পরিমাপের মানদণ্ড কি?

৬৪. এনজিওর কর্মসূচির মধ্য দিয়ে কি নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে? হলে এর সীমানা কতদূর?

৬৫. জেন্ডার ট্রেনিংয়ের প্রভাব কী?

৬৬. ক্ষুদ্র ঋণের লক্ষ্য বলা হচ্ছে গ্রামীণ দরিদ্রদের আয় বৃদ্ধি, ছোট ব্যবসা, কর্মসংস্থান ও আত্মনির্ভরশীলতা কিন্তু বছরের পর বছর ঋণ নেয়া কী কার্যকর আত্মনির্ভরশীলতা তৈরিতে সাহায্য করছে? অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী নিজে ঋণের ব্যবহারকারী নয়? এ অবস্থাকে আপনি কিভাবে দেখেন?
ক্ষুদ্র ঋণ নারীর শ্রমকে বাজারের সাথে সম্পৃক্ত করেছে, কিন্তু ঋণ নিয়ে যে সামান্য মুনাফা তৈরি হচ্ছে তা কি নারী ভোগ করতে পারছে? আপনি কি মনে করেন?

৬৭. ট্রেড ইউনিয়নের প্রয়োজনীয়তা আছে কি? কি মনে করেন?

৬৮. অধিকাংশ রিপোর্ট ও পলিসি ইংরেজি ভাষায় রচিত হয় কেন?

৬৯. রাজনৈতিক সচেতনতামূলক কর্মসূচির বাস্তবায়ন কতটুকু?

৭০. প্রত্যেক এনজিও গ্রামাঞ্চলে এলিটদের নিয়ে কমিটি গঠন করে– এর কারণ কি?

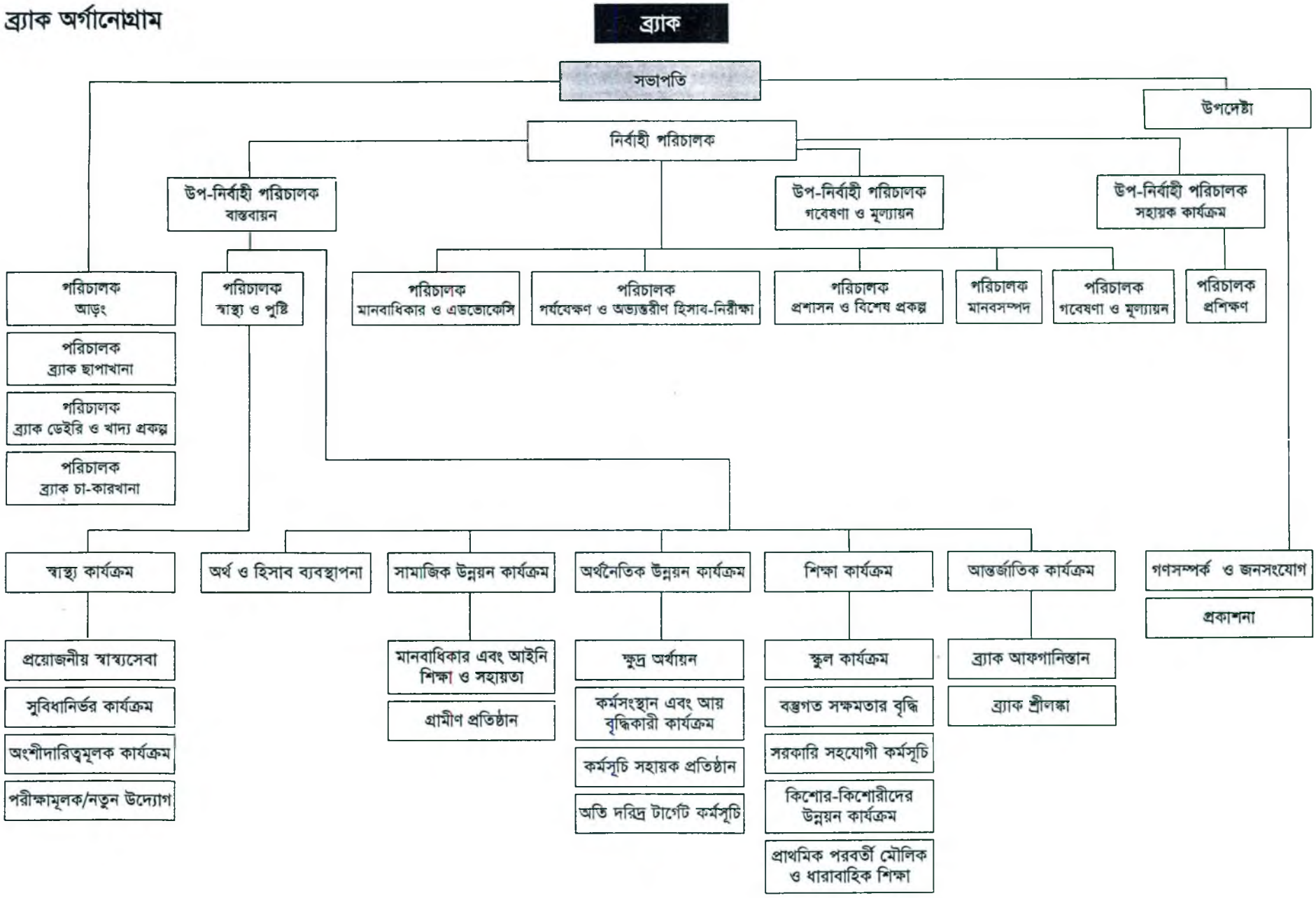

Dhaka University Institutional Repository

ব্র্যাক অর্গানোগ্রাম

PROSHIKA

A Centre for Human Development

ORGANIZATION CHART

ADC	:	Area Development Centre
ADP	:	Apiculture Development Programme
BCMSU	:	Bill Collection Monitoring Support Unit
CC	:	Central Coordinator
CDP	:	Computer Development Programme
CFO	:	Chief Financial Officer
DD	:	Deputy Director
DMPP	:	Disaster Management Preparedness Programme
DRS	:	Development Research Section
DSCP	:	Development Support Communication Programme
DW	:	Development Worker
EADP	:	Ecological Agriculture Development Programme
ESHDP	:	Extended Social & Human Developement Programme
FDP	:	Fisheries Development Programme
FSD	:	Financial Service Department
Gen. Fund	:	General Fund
GIS	:	Group Information System
GRCC	:	Gender Relations Coordination Cell
HDT	:	Human Development Training
HEP	:	Health Education Programme
HRD	:	Human Resource Department
HSP	:	Housing & Sanitation Programme
IDPAA	:	Institute for Development Policy Analysis and Advocacy
IDRC	:	Information & Documentation Resource Cell
IMEC	:	Impact Monitoring and Evaluation Cell
ITTSP	:	Irrigation & Tilling Technology Service Programme
LDP.	:	Livestock Development Programme
MFFO	:	Micro Finance Field Operation
MIS	:	Management Information Section
NP	:	Nutrition Programme
Ope. Fund	:	Operational Fund
PCD	:	Policy Communication Department
PCP	:	Peoples Cultural Programme
PED	:	Policy Education Department
PLAS	:	Proshika Legal Aid Services
PLW	:	Programme on Liberation War
PPC	:	Principle Programme Coordinator
PRD	:	Policy Research Department
RHRDC	:	Regional Human Resourc Development Centre
S. Sec.	:	Salary Section
SDP	:	Sericulture Development Programme
SDT	:	Skill Development Training
SEDW	:	Small Enterprise Development Worker
SEED	:	Small Economic Enterprise Development
SWF	:	Staff Welfare Fund
TW	:	Technical Worker
UEP	:	Universal Education Programme
UEW	:	Universal Education Worker
VSE	:	Vehicle, Store & Estate
WSAM	:	Water Supply & Arsenic Mitigation

Dhaka University Institutional Repository

প্রশিকা অর্গানোগ্রাম

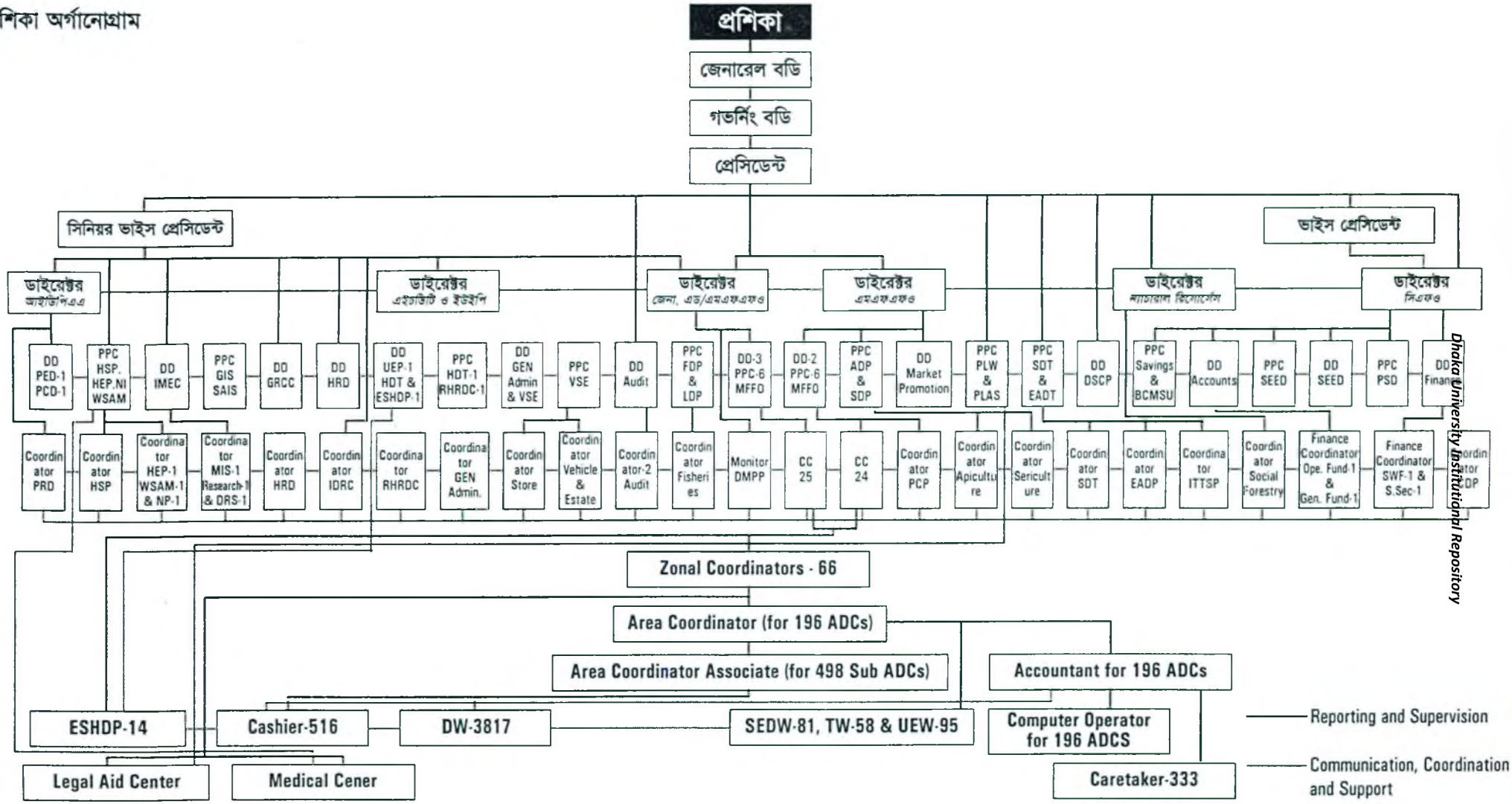

Dhaka University Institutional Repository

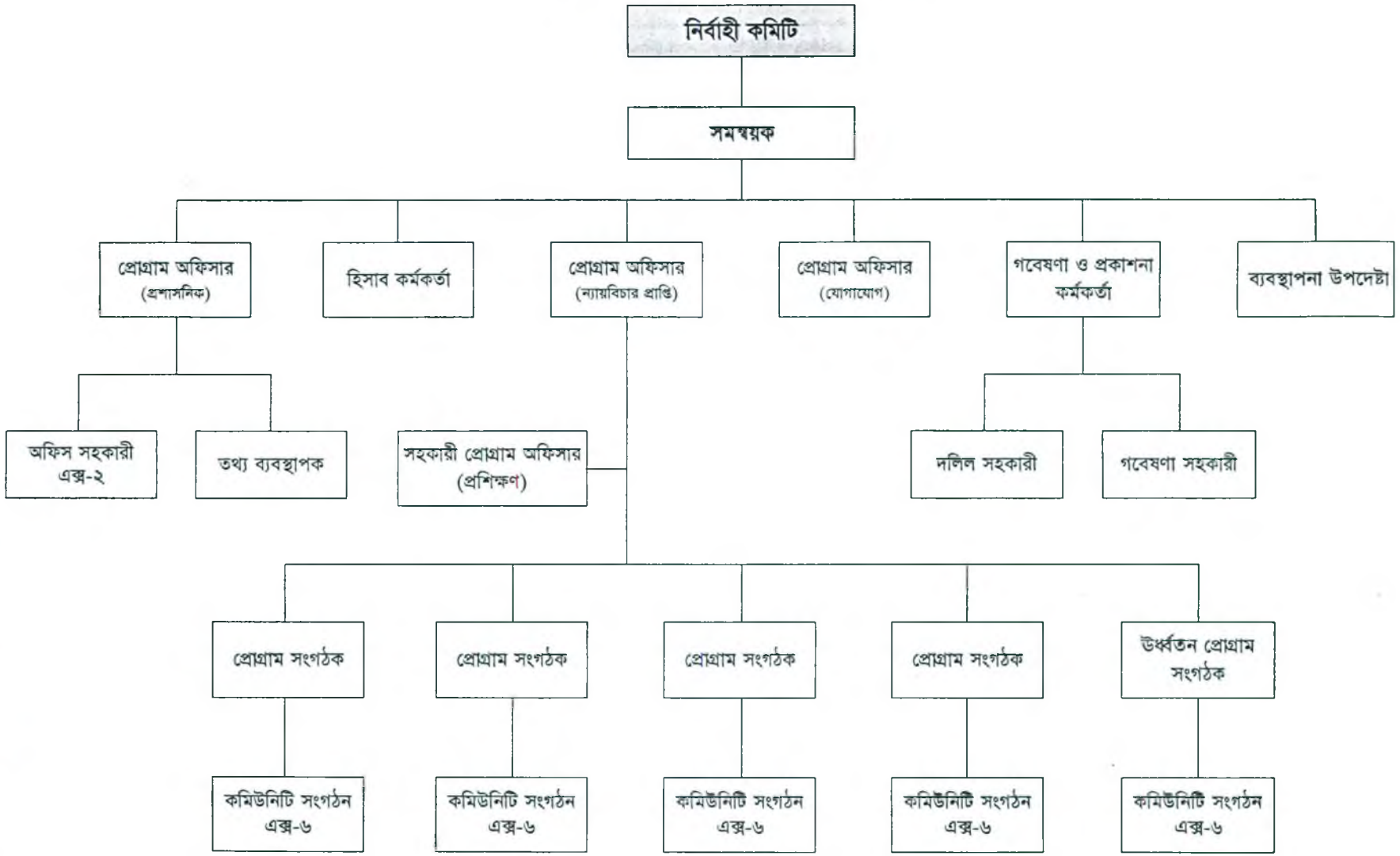

Dhaka University Institutional Repository

নাগরিক উদ্যোগের সাংগঠনিক কাঠামো

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও তথ্য

আক্তার, রফিকা (জুলাই ২০০৫): সাক্ষাৎকার।

আজাদ, লেনিন (১৯৯৭) : *বিপন্ন বাংলাদেশ রাষ্ট্র, সমাজ ও উন্নয়নের এনজিও মডেল*।

আলম, খুরশীদ (১৯৯০) : *সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি*।

আহমেদ, বশির (২০০২) : 'নারী : এনজিও টার্গেট গ্রুপ', আল মাসুদ হাসানউজ্জামান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের নারী–বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ*, পৃ-২৩৭-২৪৬।

ইউনূস, মুহাম্মদ (১৯৮২) : *বেলতৈল গ্রামের জরিমন ও অন্যান্যরা*।

ইউনূস, মুহাম্মদ (২০০৪) : *গ্রামীণ ব্যাংক ও আমার জীবন*।

ইসলাম, মনিরুল (২০০৪) : 'মস্তিষ্কের মাপজোক ও মেয়েদের বুদ্ধি', *বিজ্ঞানচেতনা*, নবম বর্ষ, জানুয়ারি-জুন প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা।

ইসলাম, মনিরুল (২০০৫) : 'কাঠামো ও পেশির পার্থক্য এবং নারী-পুরুষের উদ্যম, শক্তি ও সহনশীলতা', *বিজ্ঞানচেতনা*, দশম বর্ষ, জানুয়ারি-মার্চ, প্রথম সংখ্যা ।

কামাল, আহমেদ (২০০১) : *কালের কল্লোল বাংলাদেশ, ১৯৪৭-২০০০*।

চৌধুরী, আফসান (জুলাই ২০০৫): সাক্ষাৎকার।

জেন্ডার নীতিমালা (১৯৯৮): কর্মীদের জন্য, প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র।

জেন্ডার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ শিখন এরিয়াসমূহ (২০০৫): রাজশাহী, ব্র্যাক।

নাগরিক উদ্যোগ : *বার্ষিক প্রতিবেদন*, ২০০৪।

পারভীন, শামীমা (২০০৩) : 'নারীর ক্ষমতায়ন', সেলিনা হোসেন ও মাহমুদুজ্জামান সম্পাদিত, *নারীর ক্ষমতায়ন রাজনীতি ও আন্দোলন*, পৃ-২৩৬-২৪৮।

প্রশিকা *পারসোন্যাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম* : ছুটির আবেদন ফরম, ছুটি সম্পর্কিত তথ্য।

বিপ্লবী নারী সংহতি (২০০৫) : *ঘোষণাপত্র*।

মুক্তির পথে (২০০২), প্রামাণ্য চিত্র, ব্র্যাক টিইউপি কর্মসূচি।

মুক্তির পথে : অতিদরিদ্র কর্মসূচি বিষয়ক তথ্য। (সাল উল্লেখ নেই, ব্র্যাক)

মুশতারী, পারভীন (জুলাই ২০০৫), সাক্ষাৎকার।

মুহাম্মদ, আনু (১৯৯৭) : *নারী, পুরুষ ও সমাজ*।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ, আনু (১৯৮৮) : *বাংলাদেশে উন্নয়ন সংকট এবং এনজিও মডেল*।

যৌন হয়রানি নির্মূল করা নীতিমালা (২০০৫), ব্র্যাক।

সামাজিক এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক ১০টি ইস্যু : ব্র্যাক বিডিপি, সিএফপিআর, টিইউপি প্রোগ্রাম, ২০০২।

হাফিজা, শিফা (জুলাই ২০০৫), সাক্ষাৎকার।

হোসেন, জাকির (জুলাই ২০০৫), সাক্ষাৎকার।

Abed, Fazle Hasan : *Micro Finance NGOs in Bangladesh Growth Impact and Challenges* : Paper present at the Asian Regional Conference on 'The Potential and Limitations on Economic Initiation is Grassroots Development', Current Issues and Asian Experience 2000.

Aminuzzama, Salhuddin M (1991) : *Introduction to social research.*

Amin, Rahul and Others— *Impact of poor women's participation in credit-based self employment on their empowerment, fertility, contraceptive use and fertility desire in rural Bangladesh* annual meeting of the Population Association of America. Paper Prepared for presentation Association of America, May 5-7, 1994.

Bhasin, Kamla (2000) : *Understanding Gender.*

BRAC *Annual Report*—2003

BRAC *Annual Report*—2004

BRAC *Technical Manual (1997) Action Learning Approach to Gender and Organization Change.*

Crossing the Poverty Barrier : The Journey Ahead—Activity Report (July 2001-June 2002), PROSHIKA : A Centre for Human Development (2002).

Khandker, Shahidur R. and Muhmmad Abdul Latif : 'Role of Family Planning and Target Credit Program in Demographic Change in Bangladesh' in Muhammad Abdul Latif, Shahidur R. Khandker and Zahed H. Khan (ed.). *Credit Programs for the Poor : Household and Interhousehold Impacts and Program Sustainability*, Proceeding of Workshop, March 19-21, 1995, Vol. 2, Dhaka, Bangladesh.

Khandker, Shahidur R, M.A Baqui Khalily and Zahed H. Khan (ed.) *Credit Programs for the Poor : Household and Inter-household Impacts and Program Sustainability* : Proceeding of the Workshop, March 19-21, 1995, Vol. 1, Dhaka, Bangladesh.

Nagorik Uddog *Annual Report*—2003.

Proshika 2004 at a Glance.

Shill, Shamali (1997) : *Social Intervention of Rural Development, Impact of Micro Credit on Agricultural Community*, Partial Fulfillment of the Degree of Masters of Social Science, MSS Final Examination.

Thakurta, Meghna Guha & Begum, Suraiya (1995) : *Political Empowerment and Womens Movement*; Roushan Jahan, Sayeda Roushan Quadir, Hamida Akhter Begum, Jahanara Huq, Empowerment of Womens Nairobi to Beijing (1985-1995), Editing , Page 29-45.